Registered

মূল্য ঃ দুই টাকা

এক

শ্রমজীবী জনসমষ্টির স্বদেশ বলে কোন বস্তুই নেই, যা তাদের আদপেই নেই তা থেকে আমরা তাদের বঞ্চিত করতে পারিনা। যেহেতু সর্বহারাদের সর্বাগ্রে রাজনৈতিক আধিপত্য অর্জন করতে হবে, জাতির অগ্রচারী শ্রেণী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, নিজেদের আত্মপ্রকাশ করতে হবে একক জাতিরূপে, সে অর্থে তাদের চারিত্রবৈশিষ্ট্যই জাতীয়—
—কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো

গণবার্তা

সূচি.......... পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয়	১
পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন	১
দেশে বিদেশে	২
রাজনীতি....ফ্যাসিস্ট কৌশল	৩
ব্যাঙ্ক, বীমা বেসরকারি-করণের প্রতিবাদে ধর্মঘট	৪
ফ্যাসিবাদ ও সংঘ পরিবার	৫
মনোনয়ন পত্র জমা (গোসাবা)	৭
মনোনয়ন পত্র জমা (বাসন্তী)	৮

68th Year 29th Issue ★ Kolkata ★ Weekly GANAVARTA ★ Saturday 13th March 2021

সম্পাদকীয়

সুস্থ রাজনৈতিক এবং সামাজিক মূল্যবোধ ধ্বংসকারী দুই অপশক্তিকে পরাজিত করুন

এবছর পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে সম্ভবত প্রথমবার দুটি প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দল বাংলার রাজনীতির গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সহ শতাব্দীপ্রাচীন গণজাগরণ ও মানবিক উদারতার বাতাবরণটা ধ্বংস করছে। নিয়ন্ত্রিত সাবধানী পদক্ষেপে এতদিন পর্যন্ত এরাজ্যের রাজনৈতিক দলসমূহ নির্বাচনী মঞ্চে মন্দির মসজিদ আশ্রিত সাম্প্রদায়িকতা, জাতপাত, দুর্নীতি এবং জোরজবরদস্তি তথা নীতিবর্জিত দলবদল ইত্যাদি বিষয়ের সামাজিক দ্বন্দ্বগুলি লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করত। এবার সত্যিই এক সর্বনাশা খেলায় রাজ্য ও দেশবিদেশের তাঁবেদার পুঁজিপতিদের অর্থের জোয়ারে রাজ্যবাসীকে ভাসিয়ে দিয়ে নির্লজ্জ বেপরোয়াভাবে ঐসব সামাজিক জঞ্জালগুলি জড়ো করছে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি।

বাংলার উন্নত সামাজিকবোধ ও মানবিক চেতনার আলো সর্বভারতীয় জাতীয়তাবোধের মধ্যে সুস্পষ্ট ছাপ ফেলেছিল; এক আধুনিক সমাজ চেতনার ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিল। এক শতাব্দী ব্যাপী সেই ঐতিহ্য পুনরাবর্তিত হয়েছে উদারমানবিকতার গর্ভে সাম্যবাদী ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এই স্বোপার্জিত সুচেতনাবোধ এবং বামগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক তথা সামাজিক শক্তি ধীরে ধীরে সমাজের খেটে খাওয়া মানুষ, নিম্নবর্গভুক্ত দলিত আদিবাসী সংখ্যালঘু সমাজের সঙ্গে অন্বিত হবার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। সেই প্রচেষ্টার অন্তর্নিহিত শক্তিই সমাজের চরম দুঃসময়েও বিজয়ী হয়ে জাতপাত ও সাম্প্রদায়িক সংঘাতের উপাদানগুলিকে ধ্বংস করেছে। স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলির প্ররোচনায় সংঘর্ষ হলে বা সংঘর্ষের বাতাবরণ তৈরী হলেও সাধারণ মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছে।

নয়াউদারবাদী বিশ্বব্যবস্থার নির্মিত বাজারি আর্থসংস্কৃতির অভিঘাতে ও বামগণতান্ত্রিক শক্তির কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি সেই সুচেতনাঋদ্ধ ঐতিহ্যে চিড় ধরায়। 'বেহুলার বাসরঘরে' সূচীছিদ্র দিয়ে তথাকথিত 'পরিবর্তনের' কালনাগিনী প্রবেশ করে বাংলার শতাব্দীপ্রাচীন স্বোপার্জিত ভাবমূর্তিকে আঘাত করে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচনে সরকার পরিবর্তিত হয় সময়ান্তরে ভোটদাতাদের অভ্যাসবশে। খুব সুচতুর অপকৌশলে কর্পোরেট আনুকূল্যে রাজ্যে ক্ষমতাসীন হল তৃণমূল কংগ্রেসের স্বেচ্ছাচারী দুর্বৃত্ততন্ত্র।

এবারের নির্বাচনে আরো বৃহত্তর ন্যারেটিভ নির্মাণ করেছে সর্বভারতীয় সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িক এবং আন্তর্জাতিক কর্পোরেট লগ্নী ও ক্রোনীপুঁজির ধারকবাহক বিজেপি। রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিটি পদক্ষেপ, তা যতই সাম্প্রদায়িক আচার আচরণ, ভণ্ডামী, দুর্নীতি হোক না কেন বিজেপিকে সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই নরেন্দ্র মোদীর 'পরিবর্তনের পরিবর্তন' শ্লোগান বস্তুবাদী দর্শনের 'নেতির নেতি'র মধ্যে যে বিবর্তনের ইঙ্গিত থাকে তাকে ব্যঙ্গ করছে, ধ্বস্ত করছে। তাই দল বেঁধে তৃণমূলের দুর্বৃত্তরা শিবির বদলাচ্ছে। গণতান্ত্রিক নাগরিক চেতনা যে আবেগে জাতপাত বনাম শ্রেণি রাজনীতির দ্বন্দ্বকে লঘু করেছে, ডাস্টবিন থেকে সেইসব আবর্জনাগুলো সযত্নে রাজ্যবাসীকে চেনাতে চেষ্টা করছে মূল্যবান সম্পদ রূপে—টি এম সি ও বিজেপি। পুনর্বাসন বা পরিযায়ী সমস্যা হিসেবে দেখতে গিয়ে যখনই বামশক্তি সামাজিক ন্যায়বিচারের অধিকারকে গুরুত্ব কম দিয়েছে, তখনই এই সব প্রতিক্রিয়ার শক্তি খণ্ড খণ্ড জাতপাত সাম্প্রদায়িক সত্তাকে সংঘাতময় প্রতিযোগিতামূলক ভোট ব্যাঙ্কে সঞ্চয় করেছে।

এই প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে এক অনন্য সংগ্রামের মুখোমুখি রাজ্যের বামগণতান্ত্রিক শক্তি। ক্ষুধা দারিদ্র বেকারত্ব নির্যাতন, ফ্যাসিবাদী সংগঠন ও চেতনার বিরুদ্ধে তো নিশ্চয়ই; সংখ্যালঘু, দলিত, নিপীড়িত জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসন দানধ্যান রিলিফের দাতাগ্রহীতার সম্পর্ক থেকে মুক্ত করে আর্থসামাজিক ন্যায়বিচারের মোহনায় সমবেত করার কঠিন কাজ। মনে রাখতে হবে সংঘ পরিবার বা তৃণমূল যেই পরাজিত হোক না কেন, যে অদ্ভুত আঁধার এরা ঘনিয়ে নিয়ে এসেছে, তা এক কঠিন অথচ ট্রাজিক বাস্তবতা। এই বাস্তবতার বিকল্পে রাজ্যের বাম শক্তিতে অক্ষ করে যে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তির সংযুক্ত মোর্চা গড়ে উঠেছে, তার নেতৃত্বে রাজ্যবাসীকে সচেতন করে আসন্ন নির্বাচনে জয়লাভ করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন

সমস্ত শক্তি সংহত করে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মতো ফ্যাসিবাদী অপশক্তিকে প্রতিহত করতেই হবে

ভারতের জাতীয় জীবনে এমন ঘোর দুর্দিন আর কখনও আসেনি। স্বাধীনোত্তর ভারতে তো নয়ই। বহুবিধ সমস্যা বিভিন্ন সময়ে জাতীয় জীবনে অমানিশার সঞ্চার করলেও এমন ভয়াবহ অবস্থা আদৌ হয়নি। এমনকি, যতদূর মনে হয়, সম্ভবত ইংরাজ ঔপনিবেশিক আতঙ্কজনক অত্যাচারী অপশাসনকালেও এমন এক অস্বাভাবিক যন্ত্রণা দীর্ঘস্থায়ী রূপে দেশের জনজীবনকে ক্রমাগত বিধ্বস্ত করেনি। দ্বিতীয় পর্বের মোদী জমানা যেন অতীতের সমস্ত দুর্ভাগ্যজনক নজিরগুলিকে বানচাল করে দীর্ঘস্থায়ী কুশাসনের রেকর্ড ভেঙে চুরমার করে জাতীয় জীবনকে চরম দুর্দশায় ঠেলে দিয়েছে।

২০১৪ সাল থেকে দীর্ঘ সাত বছর যাবৎ একের পর এক চরম অনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে নিত্যনতুন যন্ত্রণার সৃষ্টি করে চলেছে মোদী সরকার। এর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লিখতে গেলে দিস্তার পর দিস্তা কাগজেও কুলিয়ে ওঠা যাবে না। একটি অন্যায়ের পর অন্য আরেকটি চূড়ান্ত যন্ত্রণার উদ্ভব ঘটিয়ে চলেছে। সাধারণ জনজীবন এক অভূতপূর্ব কঠোর সমস্যার মুখোমুখি প্রায় দিশাহারা।

মোদী সরকার একেবারে শুরু থেকেই দেশের সংবিধান ধ্বংস করার ধারাবাহিক অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে নিছক মোদী ঘনিষ্ঠ কতিপয় অতি মুনাফাশিকারী ইতর মানসিকতার ধনবান পরিবারের পক্ষেই সব সরকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছে। মোদী সরকার খোলাখুলি নির্লজ্জের মতোই বড়লোকদের উমেদারী করতে ব্যস্ত। এর ফলে ঐসব বিত্তবান, নোংরা আর্থিক সম্পদের অধিকারী পরিবারগুলির সম্পদ বেড়েছে ঝড়ের গতিতে।

শুধুমাত্র ২০২০ সালের বিশ্বত্রাস করোনা ভাইরাস সংক্রমণে যখন দেশের কোটি কোটি মানুষের জীবন চলম অনিশ্চয়তায় পর্যবসিত যখন, মৃত্যুভয় তাড়া করে চলেছে দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে, যখন সম্পূর্ণ অনৈতিক জনস্বার্থবিরোধী অবিমৃশ্যকারী অপরিকল্পনামাফিক লকডাউন ঘোষণায় ভারতের প্রায় কুড়ি পঁচিশ কোটি কর্মরত মানুষ জীবিকা হারিয়ে বস্তুত বাঁচার জন্য হাহাকার করছেন, মৃত্যু হচ্ছে লক্ষ লক্ষ, জনজীবন ত্রস্ত উদ্বাস্ত জীবন ধারণের ন্যূনতম সঙ্গতি হারিয়ে ফেলছেন প্রতিদিন প্রতি রাতে, সেই সময়েই মোদীর ব্যক্তিগত অনুগ্রহ প্রাপ্ত আদানি-আম্বানিদের সম্পত্তি বেড়েছে প্রায় তের লক্ষ কোটি টাকার মতো। অশ্লীল সম্পদের অধিকারী মানুষগুলি মোদীকে ঘিরে উল্লাসের বাতাবরণ নির্মাণ করে গেছে অবিরত।

করোনা অতিমারী ভারতের অর্থনীতি সম্পূর্ণ বরবাদ করে ফেলেছে, এই কথাটি আংশিক সত্য। করোনাকাল শুরু হবার আগে থেকেই মোদী কৃপায় দেশের অর্থনীতির অন্তর্জলি যাত্রা শুরু হয়েছে। ২০১৯-২০ সাল বা তার আগে থেকেই শিল্প উৎপাদনে ঘোর মন্দার প্রাদুর্ভাব ঘটে। ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পগুলি একে একে বন্ধ হয়ে পড়ার কারণে বেকারত্ব বা কর্মহীনতা উল্কাবেগে বাড়তে থাকে। বস্তুত প্রায় অর্ধ শতাব্দী সময়কালে সর্বাপেক্ষা বেশি বেকারত্ব গ্রাস করেছে দেশের যুবজীবনকে। সেই সময়কালেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজন, কৌশিক বসুর মতো নামজাদা অর্থনীতিবেত্তা এবং বিপুল সংখ্যক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বা অর্থনীতিবিদ আতঙ্কজনক অর্থনীতির উদ্ভব ও দীর্ঘস্থায়িত্ব সম্পর্কে আগাম সতর্কবাণী জানিয়ে এসেছেন। বিশ্ববন্দিত দার্শনিক-অর্থনীতিশাস্ত্রী ভারতের গর্ব অমর্ত্য সেন তো প্রথমাবধি নরেন্দ্র মোদী সরকারের অপকর্ম সম্পর্কে বিশেষ সোচ্চার। তাঁর গভীর জ্ঞানলব্ধ সতর্কবাণীগুলি ভারতের নয়া শাসকদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি। ভাবতে গেলে শিহরিত হতে হয় যে, ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অর্থনীতিজ্ঞ ড. মনমোহন সিং ২০১৬ সালে অবিমৃষ্যকারীপন্থায় নোটবন্দির উদ্ভট সিদ্ধান্তে মন্তব্য করেছিলেন যে, দেশের অর্থনীতির গভীর সমস্যা হবে তা, স্পষ্টভাবে তাঁর সংসদীয় অধিকার প্রয়োগ করে বেশ সোচ্চারে বলেছিলেন। পার্লিয়ামেন্টের ভাষণ মোদীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি, এমন ভাবার কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই।

ভারতের জনজীবনকে বিধ্বস্ত করা অর্থনৈতিক অপরাধগুলি মোদী সরকার নির্বিচারে করে গেছে। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা রহিত হয়ে একগুঁয়ে মনোভাব বারংবার প্রকট হয়েছে আর সেগুলি থেকে সাধারণ মানুষের নজর ঘুরিয়ে দেবার অসদুদ্দেশে কখনও পাকিস্তান আবার কখনও চিন আক্রমণ করে ভারতের সর্বনাশে সমুদ্যত এমন গল্পগাথা নিজের পোষা গণমাধ্যমগুলি মারফৎ মানুষের মনকে বিষাক্ত করেছে, বিভ্রান্ত করেছে।

দেশের প্রকৃত সমস্যাগুলি গোপন করার লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র ধ্বংস করার কুৎসিৎ কাজে ষড়যন্ত্র করেছে। ধর্মবিশ্বাসকে হাতিয়ার করে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিদ্বেষ রচনা করেছে। আর এস এস নামক একটি ক্রুর ফ্যাসিবাদী সংগঠনকে নিবিড়ভাবে কাজে লাগিয়ে চূড়ান্ত অসহিষ্ণুতার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মের ব্যবহার নিয়মিত হবার ফলে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবাদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়েছে ব্যাপকভাবে। ভারতের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, আদিবাসী, দলিত সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে সংখ্যাগুরু অংশের একাংশকে হিংস্র আচরণে প্রমত্ত

এরপর ৬-এর পাতায়

সরকার বিরোধিতা এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতা সমার্থক নয়

সরকারের বিরোধিতা বা প্রতিবাদ করার অধিকার গণতন্ত্রের অন্যতম মূল নির্যাস। নাগরিকদের কাছে এই অধিকার সংবিধান প্রদত্ত অধিকার। ৭৪ বছরের পুরানো গণতান্ত্রিক ভারত রাষ্ট্রে এত দিনে এই অধিকারটি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হবে, এমন প্রত্যাশা ছিল। নাগরিকদের এই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। বর্তমান জমানায় সারা দেশে সরকার-বিরোধিতা দেশদ্রোহ মামলার বিষয়ে পরিণত হচ্ছে ক্রমবর্ধমান হারে, যা অবশ্যই উদ্বেগজনক। এমন পরিস্থিতিতে দিল্লীর পাতিয়ালা হাউস আদালতের বিচারক দিশা রবির মামলার রায়ে বলেছেন, টুলকিট হ্যান্ডেলে দিশা এমন কিছু বলেনি বা করেনি যাতে তাঁকে দেশের শত্রু হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। এই মামলায় আদালত বেশ স্পষ্টভাবেই বলেছেন, সরকার এবং দেশ বা রাষ্ট্র এক নয়। রাষ্ট্র গুণগত এবং পরিমাণগত ভাবে সরকার থেকে আলাদা। গণতন্ত্রে নির্বাচিত সরকারকে বিরোধীদের মতামতকে দেশ বা রাষ্ট্রের 'অপর কণ্ঠ' হিসাবে মান্যতা দেওয়া প্রয়োজন। বর্তমান স্বৈরাচারী জমানায়—ক্ষমতাসীনরা সচেতন ভাবেই প্রতিবাদ বা বিরোধিতার কণ্ঠকে স্তব্ধ করার লক্ষ্যে সরকারের সব রকম প্রতিবাদকে দেশের বিরুদ্ধে বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসাবে প্রতিপন্ন করার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হয়ে উঠেছে, যা গণতন্ত্রের পক্ষে এক অশনিসংকেত। ক্ষমতাসীনদের এমন প্রতিশোধমূলক মানসিকতা শুধুমাত্র স্বৈরাচারী মানসিকতারূপে অভিহিত করলে অনেক কম বলা হয়। কারণ এমন মানসিকতার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে ফ্যাসিবাদের বীজ। বিষবৃক্ষ ফু লে ফলে বিকশিত হওয়ার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। ফ্যাসিবাদ, তা সে সমাজ জীবনে, রাজনৈতিক জীবনে, সংস্কৃতিতে, শিল্পে, ধর্মীয় জীবনে, শিক্ষায় সর্বত্র কোনও বিরোধিতাকে বরদাস্ত করে না। ভারতবর্ষে তারই দুর্লক্ষণগুলি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সময়ের অপেক্ষা শুধুমাত্র। গত কয়েক বৎসরে ভারতের সমাজ ও রাজনীতির জীবনে এর চেয়ে বড় ক্ষতি আর হয় নি।

পাতিয়ালা হাউস আদালতের মাননীয় বিচারক আরও বলেছেন, প্রতিবাদ নাগরিকের অধিকার এবং আন্তর্জাতিক শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রতি লক্ষ্য করে কথা বলাও সেই অধিকারের অন্তর্গত। দেশের সরকারের কোনও কাজ যদি কারও কাছে খারাপ মনে হয়, তবে সেই কাজের যেমন বাড়িতে বসে সমালোচনা করা যেতে পারে, সমাজ মাধ্যমেও সেই কাজের সমালোচনা গণতান্ত্রিক অধিকারের মধ্যেই পড়ে, বাক্ স্বাধীনতার মধ্যেই পড়ে। দিল্লীর কৃষক আন্দোলনকে ঘিরে যে হিংসাত্মক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, দিশা রবির বার্তা বিনিময়ের সাথে তার সামান্যতম সংযোগও পাওয়া যায় নি; তবে কিসের ভিত্তিতে এই তরুণীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল? বস্তুত ভীমা কোরেগাঁও থেকে হাথরস, হাথরস থেকে টুলকিট, বর্তমান সরকারের দেশদ্রোহিতার নামে বিরোধী নাগরিকদের নাস্তানাবুদ করার অভিযান চলছে সাড়ম্বরে। অশিক্ষা, অসচেতনাতার কারণে বহু নাগরিকরাই মনে করছেন, সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলাই অপরাধ, তাই কবি ভারভারা রাও থেকে দিশা রবি সকলেই অপরাধী—এরা জামিনে মুক্ত হলেও বিচারাধী তো বটেই। অতএব গ্রেপ্তার হওয়ার সম্ভাবনা বা দেশদ্রোহীরূপে চিহ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেই, বুঝে শুনে চলার মানসিকতাই বাড়বে, আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রবণতা বাড়বে—গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতার চূড়ান্ত পরাজয়ের সম্ভাবনা বাড়বে, কর্তৃত্ববাদী অসহিষ্ণু সরকারের জমানায় ভারতের দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে।

করোনা অতিমারি কি এবছরেই উধাও হয়ে যাবে!

করোনা অতিমারি কি এবছরেই উধাও হয়ে যাবে! বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ এমন ভাবলেও, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে যে বার্তা দেওয়া হয়েছে তা কিন্তু আদৌ স্বস্তিদায়ক নয়। হু-র পক্ষ থেকে জরুরী বিভাগের শীর্ষ আধিকারিক মনে করছেন, এই বছরের মধ্যেই করোনা অতিমারি 'ভ্যানিশ' হয়ে যাবে এমন ভাবনা অপরিণত ও অবাস্তব। লকডাউন এবং গণটিকাকরণের ফলে সংক্রমণের সংখ্যা কমলেও আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই। আগামী দিনগুলিতে করোনা প্রকোপ কমলেও, এত তাড়াতাড়ি পৃথিবী পুরোপুরি করোনামুক্ত হবে না।

বিগত দেড় মাসে করোনা সংক্রমণের হার নিম্নমুখী হলেও, করোনা স্বাস্থ্যবিধি পুরোপুরি মেনে না চললে বা গা ছাড়া মনোভাব দেখালে করোনা ঢেউ ফের আছড়ে পড়তেই পারে। অপ্রত্যাশিত নয়, গত সপ্তাহে ইউরোপ, আমেরিকা, ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি অঞ্চলে করোনা সংক্রমণের হার বাড়ছে, আগের মতো কড়াকড়ি না থাকায় এবং সাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে না মেনে চলার জন্যই এমন পরিস্থিতি। শুধুমাত্র প্রতিষেধকের উপর পুরোপুরি নির্ভর করলে মারাত্মক ভুলই হবে। করোনা প্রতিরোধে কোনও রকম ঢিলেমি দিলেই তা ফের মাথাচাড়া দেবে। প্রসঙ্গত, আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের নানা দুষ্কর্মের দোসর ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জাইর বোলসোনারোর ঢিলেঢালা মনোভাবেই ব্রাজিলের করোনা পরিস্থিতি এখন প্রায় লাগামছাড়া হয়েছে। তদুপরি নতুন ব্রাজিল স্ট্রেনের দাপটে সে দেশে সংক্রমণ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, অর্ধেকের বেশি হাসপাতালে আর শয্যা খালি নেই, ওই দেশে যাঁরা এখনও বিষয়টিকে পাত্তা দিচ্ছেন না তাঁদের উদ্দেশ্যে 'হু' থেকে এক সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, **এখনই হাল না ধরলে হাসপাতালে বা গোরস্থানে কোথাওই জায়গা মিলবে না।**

'আত্মনির্ভর ভারত' নির্মাণের লক্ষ্যে অভিযান চলছে

'আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণের লক্ষে মোদী সরকার দ্রুত এগিয়ে চলেছে। কোনও রাখঢাক না রেখে খোলাখুলি যা বলা হচ্ছে তা হল : এই সরকার তোষামুদে পুঁজির সরকার, এই সরকার তোষামুদে পুঁজির জন্য সরকার।

সাধারণ মানুষ কেবল তোষামুদে পুঁজির আক্রমণে সর্বস্ব খোয়ানোর অপেক্ষায় আছে। ভারত রাষ্ট্রের ভূমিকা রূপান্তরিত হয়েছে। বর্তমান ভারতরাষ্ট্র সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার জন্য আর দায়বদ্ধ নয়। সরকার পেছিয়ে যাচ্ছে, তোষামুদে পুঁজির প্রভাব বিস্তারিত হচ্ছে। লকডাউন পর্বে একদিকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার নোটিশে লক্ষ লক্ষ প্রবাসী শ্রমিক কর্মচ্যুত, বাস্তুচ্যুত হয়ে প্রখর দাবদাহে ঘরে ফেরার তাগিদে স্ত্রী পুত্র পরিবার সহ শত শত মাইলের পদযাত্রায় সামিল হয়েছে। সংবাদ মাধ্যমে, দূরদর্শনের পর্দায় ভেসে উঠেছে হৃদয় বিদারক দৃশ্য। অপর দিকে দেখা গেল আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণের অন্যতম প্রধান কাণ্ডারী তাঁর বিলাসবহুল প্রাসাদের সংলগ্ন উদ্যানে ময়ূরদের খাওয়ানোর মধ্য দিয়ে অবসরযাপন চিত্তবিনোদনে ব্যস্ত গণতন্ত্রের কি অপার মহিমা! রোম পুড়ছে, সম্রাট নিরো বেহালা বাদনে ব্যস্ত। প্রধানমন্ত্রী মোদীর এক সাম্প্রতিক ভাষণে শোনা গেল, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ব্যবসা-বাণিজ্যে কেবল ক্ষতিই হয়, মুনাফা নয়। সরকারকে অনেক বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়, বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে যা প্রায়শই অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রাষ্ট্রের প্রধানের ভাষণে এমন জঘন্য মিথ্যায় লজ্জায় অধোবদন হতে হয়। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বহু সংস্থার বছরের পর বছর মুনাফা অর্জনের অসংখ্য উদাহরণ তো হাতের কাছেই আছে।

সুতরাং বেসরকারিকরণের লক্ষ্যে দ্রুত পদচারণা করে আত্মনির্ভরতা অর্জন করতেই হবে, এমন দাবিই করছেন রাষ্ট্রপ্রধান মহাশয়। অতএব রেল, খনি, বন্দর সব কিছু বিক্রি করে, গোটা দেশ তোষামুদে পুঁজির হাতে তুলে দিতে হবে। সরকারি নিয়ন্ত্রণে ফসল কেনাবেচার কেন্দ্র 'মান্ডি ব্যবস্থা' দ্রুত ভেঙ্গে পড়ছে। 'আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণ' যাত্রায় গতি সঞ্চারিত হচ্ছে। মাণ্ডি ব্যবস্থার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটলে এস এস পি বা ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের দাবি তো অবান্তর বা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে। মান্ডি না থাকলে এফ সি আই -এরও খাদ্যশস্য সংগ্রহের কোনও দায় থাকবে না। শস্য সংগ্রহের পরিকাঠামোর বারোটা বাজিয়েই আত্মনির্ভর ভারত গড়ে উঠবে। মজার ব্যাপার আমরা অনেকেই আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণের ফেরিওয়ালার কথা বিশ্বাস করছি।

ন্যূনতম সহায়ক মূল্য না থাকলে স্বনির্ভর শস্য উৎপাদন বা চুক্তিভিত্তিক উৎপাদন, যাই হোক না কেন বেসরকারি সুবৃহৎ শস্য সংগ্রহকারী সংস্থাগুলির কৃপা নির্ভর হতে বাধ্য হবে। আত্মনির্ভরতা অর্জনের পথে দৃঢ় পদক্ষেপ বৈকি! গণবন্টন ব্যবস্থা না থাকলে রেশন ব্যবস্থাও মুখ থুবড়ে পড়বে। গরিব মধ্যবিত্ত মানুষদের দুর্ভোগ অনিবার্যভাবেই চরম পর্যায়ে পৌঁছাবে। পাশাপাশি অত্যাবশ্যক পণ্য আইনের সংশোধন করে খাদ্যশস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থারও অস্তিত্ব থাকবে না। আত্মনির্ভরতার অনন্য উদাহরণ! তোষামুদে পুঁজির স্বার্থে নিবেদিত প্রাণ মোদী সরকারের জমানায় কৃষক এবং উপভোক্তা উভয়েই প্রকৃত অর্থে 'আত্মনির্ভর' হয়ে উঠবে। আদানি আম্বানিদের চর্বি বাড়ানোর জন্য ব্যস্ত সরকারের শস্য উৎপাদক বা উপভোক্তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার সময় কোথায়। কালে দিনে কর্পোরেট পুঁজির চূড়ায় বসে আদানি-আম্বানিরা অগণিত সাধারণ মানুষের রক্তঘামের বিনিময়ে আরও ফুলে ফেঁপে উঠবে। 'আত্মনির্ভর ভারত' জিন্দাবাদ!

সেনা অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে মায়ানমারে বিক্ষোভ চলছে

ইয়াঙ্গন, ৩ মার্চ : আন্তর্জাতিক ভ্রুকুটি উপেক্ষা করেই মায়ানমারে সেনা প্রশাসন বিক্ষুব্ধ জনতার বিরুদ্ধে রক্তাক্ত অভিযান জারি রেখেছে। ৩ মার্চ সেনা অভ্যুত্থানের প্রতিবাদে হাজার হাজার মানুষের প্রতিবাদ মিছিলের উপর এক সঙ্গে রবার বুলেট, কাঁদানে গ্যাস ছাড়াও নিরস্ত্র জনতার উপর সেনা পুলিশ গুলি চালায়—এই পুলিশী আক্রমণে ইয়াঙ্গনের রাজপথে কমপক্ষে ১০ জন বিক্ষোভকারী নিহত হয়েছেন, অসংখ্য মানুষ আহত হয়েছেন।

মায়ানমারের সাধারণ মানুষ ছাড়াও সরকারি কর্মচারীরাও সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভে অংশগ্রহণ করছেন।

বিরোধী নেত্রী অউং সাং সুচি সহ আন্দোলনকারী সব নেতানেত্রীদের মুক্তি এবং গণতান্ত্রিক সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার দাবিতে এই আন্দোলন চলছে। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন বন্ধ হবে না।

রাশিয়ার উপর জো বাইডেন প্রশাসনের এক গুচ্ছ নিষেধাজ্ঞা

অ্যালেক্সেই নাডালনিকে খুনের চেষ্টা ও গ্রেফতার করায় আমেরিকার নতুন রাষ্ট্রপতি বেশ ক্ষুব্ধ—রাশিয়ার উপরে এক গুচ্ছ নিষেধাজ্ঞা চাপানো হয়েছে। রাশিয়াও পাল্টা হুমকিতে বলেছে, আমেরিকার ঐ কাজটা ভাল হল না, এর ফল তাকে ভুগতে হবে। প্রসঙ্গত অ্যালেক্সেই নাভালনি রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের তীব্র সমালোচক। নাডালনিকে বিষ প্রয়োগে খুন করার অভিযোগ উঠেছে পুতিন প্রশাসনের বিরুদ্ধে।

দেশে ফিরলে নাভালনিকে গ্রেপ্তার করা হয়। মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে চার শীর্ষস্থানীয় রুশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা চাপানো হয় আমেরিকার পক্ষ থেকে। ইউরোপীয় ইউনিয়নও বাইডেনের সিদ্ধান্ত সমর্থন করে। প্রতিক্রিয়ায় রুশ বিদেশ দপ্তর থেকে এক ঘোষণা বলা হয়েছে, জাতীয় স্বার্থে কোনও বিদেশি হুমকি রাশিয়া গ্রাহ্য করবে না। পশ্চিমী শক্তি আগুন নিয়ে খেলা করছে তাদের নিজেদেরই এর ফল ভুগতে হবে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অনতিপূর্বে তালিবানদের গুলিতে তিন তরুণী আফগান সাংবাদিক নিহত

সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে জানা গেল, কয়েক দিন আগে তালিবানদের গুলিতে আফগানিস্তানে তিন তরুণী সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। বিস্ফোরণে এক মহিলা চিকিৎসকও প্রাণ হারিয়েছেন। তালিবানদের বিচারে এঁরা সকলে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধে অপরাধী। নারী হওয়া সত্ত্বেও এঁরা পেশাদার কর্মী ছিলেন। স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতেন, কথাবার্তা বলতেন, অতএব এঁদের স্পর্ধা ক্ষমার অযোগ্য। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে এই তালিবানি অনাচার এক ভয়ঙ্কর বার্তা দেয়।

দীর্ঘদিনের বৈষম্য এবং বঞ্চনা মেয়েদের আর্থসামাজিক ভাবে দুর্বল করেছে। একপ্রকার পরিকল্পিত নীরব হিংসা জনজীবনে মেয়েদের অবস্থানকে ক্রমশ সঙ্কুচিত করছে। সারা বিশ্বেই বিশেষত দরিদ্র দেশগুলি এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিকে মেয়েদের সামাজিক অবস্থানে তারতম্য বিশেষ নেই বললেই চলে। উদাহরণ হিসাবে ভারতের কথা উঠে আসে। ভারতের শ্রমশক্তিতে মেয়েদের যোগদান ক্রমশ কমছে।

তিন দশক আগে কর্মক্ষম মেয়েদের ত্রিশ শতাংশের বেশি রোজগারে নিযুক্ত ছিলেন। এখন মাত্র এগারো শতাংশ রোজগারে নিযুক্ত। এক সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী বারতে নিয়মিত ভাবে খুব কম সংখ্যক মহিলা রোজগারে নিযুক্ত। লকডাউন পর্বে মেয়েদের অবস্থাটা কাজের বাজারে আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছে। তাছাড়া মাত্রাতিরিক্ত গার্হস্থ্য হিংসার ঘটনাও বেড়ে চলেছে। রাষ্ট্রপুঞ্জ ক্রমবর্ধমান গার্হস্থ্য হিংসাকে 'ছায়া অতিমারি' বলেই অভিহিত করেছে। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে যে প্রশ্নকে দূরে সরিয়ে রাখা যায় না তা হল শিক্ষাহীন, কর্মহীন, নিরাপত্তাহীন জীবনই কি বর্তমান শতকের নারীদের প্রাপ্য?

রাজনীতি থেকে রাজনীতিকে বিযুক্ত করবার ফ্যাসিস্ট কৌশল

গৌতম রায়

অদ্ভুত পরিস্থিতির ভিতরে এইবারের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে। স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত যতগুলো বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে, কখনোই এবারের মতো এমন অদ্ভুতুড়ে পরিবেশ-পরিস্থিতি কিন্তু নির্বাচন ঘিরে তৈরি হয়নি। প্রতিবারই যে কোনো বিধানসভা নির্বাচনের সময়ে রাজনৈতিক ইস্যুগুলি সহ অর্থনৈতিক ইস্যুগুলি সামনে আসে। একদম যে অরাজনৈতিক বিষয়গুলি আসে না তা নয়, তবে অরাজনৈতিক বিষয়গুলি কিন্তু ভোটের রাজনীতিতে সবথেকে বেশি প্রাধান্য কখনো পায়নি। মানুষের রুটি-রুজির প্রশ্নগুলিই সব সময় যেকোনো ভোটে সব থেকে বেশি সামনে এসেছে। মানুষের অধিকারের প্রশ্ন সামনে এসেছে। নারীর স্বাধিকারের প্রশ্ন সামনে এসেছে। সংখ্যালঘুর অধিকারের প্রশ্ন এসেছে। ছাত্র যুবদের নানা ধরনের সমস্যাবলী এসেছে। কর্মসংস্থানের প্রসঙ্গ এসেছে। শিল্পায়নের প্রসঙ্গ এসেছে।

কিন্তু এবারের নির্বাচনে এই সমস্ত বিষয়গুলি আজ পর্যন্ত বামপন্থী এবং তাদের সহযোগী কংগ্রেস ও আই এস এফ (ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট) ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক দল, কোনো অবস্থাতেই সামনে তুলে ধরছে না। ঠিক একইভাবে সমস্ত প্রচারমাধ্যম, সেটি সংবাদমাধ্যম হোক বা বৈদ্যুতিন হোক, তারা কেউই এই মানুষের সাধারণ রুটি-রুজির প্রশ্নগুলি, মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার বিষয়গুলিকে একবারের জন্যও সামনে আনছে না। রাজনীতিকে বাদ দিয়ে রাজনীতি করার এই অদ্ভুত প্রবণতার ভিতর দিয়ে এবারের নির্বাচনকে সামনে আনার চেষ্টা করছে একটা শক্তি। এই শক্তির মূল লক্ষ্য হলো যে কোনো উপায়ে মানুষকে তাঁদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হওয়া থেকে বিরত করা। মানুষ যাতে নিজের অধিকার না বুঝে উঠতে পারে, মানুষ যাতে কোনো অবস্থাতে নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে, শাসকের কাছে নিজেদের দাবি-দাওয়াগুলিকে তুলে ধরতে না পারে, তেমন একটা জঙ্গম অবস্থা তৈরী করে, মানুষকে একটা নিশ্চেষ্ট অবস্থার মধ্যে নিয়ে ফেলে, ভোটের রাজনীতিকে ফ্যাসিস্ট শক্তির করায়ত্ত করবার দিকেই প্রচার মাধ্যম এবং রাজনীতির একটা বড় অংশের লোকেদের বিশেষ রকমের ভূমিকা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

গত দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের ক্ষেত্রে এক চুলও অগ্রগতি হয় নি। যে সমস্ত ছোট ছোট শিল্পগুলি ছিল, তারা ধুঁকছে বা বন্ধ হয়ে গেছে। হাজার হাজার মানুষ বেকার। বেকারত্বের জ্বালায় মানুষ ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে। সামান্য রুটিরুজির তাগিদে মানুষ কোন জায়গায় নিজেদেরকে নিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে তার ভয়াবহ মর্মস্পর্শী ছবি তো আমরা দেখতে পেলাম গত লকডাউনের সময়কালে। অথচ এ নিয়ে কিন্তু না রাজ্যের শাসক দল, না কেন্দ্রের শাসক দল, কারো কোনো হেলদোল আছে। রাজ্যে যে সমস্ত সংবাদ মাধ্যমগুলি নির্বাচনকে ঘিরে নানা ধরনের সংবাদ প্রতিবেদন, সংবাদ বিশ্লেষণ ইত্যাদি তুলে ধরছে, সেখানে কিন্তু এই যে কর্মসংস্থানের সমস্যা, বেকারত্বের সমস্যা, ব্যাপক ছাঁটাই, কর্মহীনতা, মানুষের ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকট—এসব সম্পর্কে কোনো রকম দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হচ্ছে না। মানুষকে ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে কেবলমাত্র দলবদলের রাজনীতিতে। কেবলমাত্র চটুল কথায়। কেবলমাত্র অরাজনীতির নানান ধরনের বিষয়গুলিকে রাজনীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে।

কোন্ রাজনৈতিক নেতা সকালে কোন্ দলের থাকলেন, আর বিকেলে কোন্ দলে গিয়ে এলেন, দুপুরবেলায় আবার তিনি কোন দলে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করেছিলেন, এই গবেষণার উপরই কিন্তু সমস্ত রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার দিকে যেমন বুর্জোয়া রাজনৈতিক শক্তিগুলোর, তেমনিই সংবাদ-মাধ্যমগুলিরও লক্ষ্য। রাজনীতিকে অরাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করে, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা থেকে মানুষকে অন্যদিকে প্রভাবিত করবার এই প্রবণতা এবারের নির্বাচনে এক ভয়াবহ বিপদজনক ভাবে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার উপরে চেপে বসছে।

এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে কিন্তু আগামী লোকসভা নির্বাচন, যেটা তিন বছর পরে হতে চলেছে, এই সময়কালের যেসব রাজ্যগুলির বিধানসভা নির্বাচন হবে, সেই নির্বাচনগুলির উপরেও, এই রাজনীতিকে অরাজনীতিতে পরিণত করবার প্রবণতা অত্যন্ত বেশিভাবে পড়বে। আর এস এস এবং তাদের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপি কিন্তু এটাই চাইছে। আর এস এসের হাজারো রকমের সহযোগী সংগঠন, যাদেরকে আমরা এককথায় সংঘ পরিবার বলে থাকি, তাদের মাধ্যমে এই রাজনীতি বিযুক্ত রাজনীতির দিকে সাধারণ মানুষকে পরিচালিত করার লক্ষ্যে নানা ধরনের সামাজিক প্রযুক্তি চলছে।

একইভাবে আর এস এস, বিজেপির ছুপা রুস্তম সহযোগী যেসব দলগুলি আছে, যেমন, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস ও ওড়িশায় বিজু পট্টনায়কের পুত্র নবীন পট্টনায়কের দল, বিজেডি, বা তামিলনাড়ুতে এআইএডিএমকে—এই সমস্ত দলগুলিও কিন্তু একই ভাবে মানুষকে রাজনীতির বাইরে রাজনীতি করানোর দিকে নিজেদের পরিচালিত করে চলছে। সেই লক্ষ্যেই খুব নিবিড়ভাবে নিজেদের পর্যবেক্ষণকে পরিচালিত করে চলেছে। তারা কোনো অবস্থাতেই সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলি যাতে মানুষের সামনে তুলে ধরা না হয়, তার জন্য যেমন তাদের নিজেদের রাজনৈতিক শক্তিকে নিয়োগ করছে, তেমনিভাবেই তারা সংবাদমাধ্যম-গুলোকে প্রশাসনের নানান সুযোগ-সুবিধা, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি পাইয়ে দিয়ে, তাদেরকেও সেই ভাবে পরিচালিত করছে।

এটি একটি আন্তর্জাতিক প্রবণতা হিসেবে উঠে আসছে বেশ কয়েক বছর ধরে। আমরা আমেরিকার ক্ষেত্রেও গত চার বছরে একই ধরনের প্রবণতা দেখতে পেয়েছি। তাদের সাবেক রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের আচার-আচরণ, চিন্তাভাবনা, রাজনৈতিক বিচার-বিশ্লেষণ ভেতর দিয়ে এটা আমরা দেখেছি। ঠিক তেমনটাই কিন্তু আমরা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ক্ষেত্রে দেখতে পেয়েছি। লকডাউনের সময়কালে যেভাবে থালা বাজানো, নিষ্প্রদীপ করা, ঘণ্টা বাজানো ইত্যাদি অবৈজ্ঞানিক ভাবনাচিন্তাগুলিকে নরেন্দ্র মোদী সামনে তুলে এনেছিলেন, করোনা জনিত সমস্যাকে বৈজ্ঞানিক-ভাবে মোকাবিলা করার, স্বাস্থ্যসম্মত-ভাবে মোকাবিলা করার পরিবর্তে, তার ভেতর অবৈজ্ঞানিক দিকগুলিকেই তুলে ধরবার ভিতরে রাজনীতি থেকে রাজনীতিকে বিযুক্ত করার যে প্রবণতা, সেটাই ছিল মূল লক্ষ্য।

কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচন উপলক্ষে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি তাদের নিজেদের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত করে চলেছে বিভাজনের রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে। পশ্চিমবঙ্গে বিভাজনের নানা রকমের নিত্য নতুন কৌশলে আর এস এস তাদের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপি এবং হাজারো রকমের সহযোগী সংগঠন, যাদেরকে সংঘ পরিবার বলে উল্লেখ করা হয়, তাদের মাধ্যমে করে চলেছে। প্রত্যেকটি কর্মসূচির মূলেই কিন্তু রয়েছে রাজনীতি থেকে রাজনীতিকে আলাদা করে দেওয়ার প্রবণতা। সাধারণ মানুষের রুটিরুজি, দৈনন্দিন সমস্যা, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সমস্যা—এগুলি থেকে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার প্রবণতা।

মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে নানা কৌশলে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সচেতন মানুষ, প্রগতিশীল মানুষ, তাঁরাও অনেক সময় বুঝে উঠতে পারছেন না যে, সাম্প্রদায়িকতার বিষ, সম্প্রদায়ের মৌলবাদী ধারণা, ধর্মান্ধ মৌলবাদী শক্তি কি ধরনের পদ্ধতিতে হিসেবনিকেশ করে তাঁদের মধ্যে সংক্রমিত করছে। এই যে সংক্রামক ভাইরাস, তা কিন্তু করোনা ভাইরাসের থেকেও ভয়াবহ মারাত্মক।

সম্প্রতিকালে বামফ্রন্ট এবং তার সহযোগী কংগ্রেসের সঙ্গে ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল ফ্রন্ট, আই এস এফ-এর নির্বাচনী বোঝাপড়াকে ঘিরে এই প্রবণতা পশ্চিমবঙ্গের বুকে ধর্মান্ধ মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক শক্তি, নানা ধরনের সংবাদমাধ্যম এবং তাদের সামাজিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। এটিও কিন্তু রাজনীতি থেকে রাজনীতিকে বিযুক্ত করবার একটি প্রবণতা। একটি ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক অপকৌশল।

শাসক শিবির প্রথমে কংগ্রেসের সঙ্গে বামপন্থীদের রাজনৈতিক বোঝাপড়া, বিশেষ করে নির্বাচনকেন্দ্রিক বোঝাপড়া ঘিরে নানা ধরনের অপকৌশল নিতে শুরু করে। নানা ধরনের বিভ্রান্তিকে সামনে এনে মানুষের যে ঐক্য গড়ে উঠছে, সেই ঐক্যকে তারা বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করে। বিপথে পরিচালিত করার চেষ্টা করে। রাজনীতিতে কোনো স্থাবর জঙ্গম একটা পরিবেশ থাকে না। পরিস্থিতির নয়, বা কোন বদ্ধ জলাশয়ের নয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক চিন্তা চেতনার ধারা নানাভাবে বিকশিত হতে পারে। সাধারণ মানুষের দাবি দাওয়ার প্রশ্নে, মানুষের অর্থনৈতিক চাহিদার প্রশ্নে, রাজনীতির গতিপথ যে নানাভাবে, নিত্যনতুন কৌশলে পরিচালিত হতে পারে, সেই দিকে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে, আর এস এস পরিচালিত বিজেপি এবং তাদের সহযোগী, কিন্তু খাতায় কলমে নয়, গোপনীয়ভাবে, তৃণমূল কংগ্রেস নানা ধরনের কৌশল চালিয়েছে বামফ্রন্টের সঙ্গে কংগ্রেসের নির্বাচনী সমঝোতাকে ঘিরে। তাদের তাঁবেদার সংবাদপত্রগুলি নানা ধরনের অপকৌশল ছড়িয়েছে। নানা ধরনের বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছে।এগুলি করে তারা যখন শেষ পর্যন্ত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি, পরবর্তীতে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের সঙ্গে এই বামপন্থী ও কংগ্রেসের বোঝাপড়া এবং সর্বোপরি একটি সংযুক্ত মোর্চা তৈরি করে, নির্বাচনী সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টিকে সাম্প্রদায়িক ভাবে পরিচালিত করার জন্য নানা ধরনের অপকৌশল নিতে শুরু করেছে।

এই অপকৌশল নেওয়ার ক্ষেত্রে আর এস এস সরাসরি তাদের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপিকে খুব একটা ব্যবহার করছে না। ব্যবহার করছে তাদের হাজারো রকমের সহযোগী সংগঠন, অর্থাৎ, সঙ্ঘ পরিবারের নানা ধরনের শাখা-প্রশাখাগুলিকে। ব্যবহার করছে ভয়াবহ সামাজিক প্রযুক্তিকে।

অপরপক্ষে এ সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে একটা নীরবতার অভিনয় করে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস প্রকাশ্যে। কিন্তু গোপনে তারা ভয়ঙ্কর রকম সাম্প্রদায়িক প্রচার এই বিষয়টিকে ঘিরে চালাচ্ছে, যাতে বামপন্থীদের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি তৈরি হয়। বামপন্থীদের মধ্যে একটা সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরি হলে শেষ পর্যন্ত লাভ হয় বিজেপির। তার জন্য এই আব্বাস সিদ্দিকীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ঘিরে নানা ধরনের সাম্প্রদায়িক বিভ্রান্তি ছড়াতে শুরু করেছে।

এই বিভ্রান্তির শিকারে যে শুধু সাম্প্রদায়িক মানুষরা হচ্ছেন বা হবেন এটা কিন্তু নয়। এই বিভ্রান্তির শিকার কিন্তু সামগ্রিকভাবে বামপন্থী আন্দোলনের মধ্যেই নানাভাবে রয়েছেন এমন মানুষরাও হতে চলেছেন। এভাবে বিভ্রান্তি ছড়ানোর প্রক্রিয়া তাই কিন্তু ফ্যাসিস্ট ধর্মান্ধ শক্তির একমাত্র লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যেই তারা তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে।

ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের সঙ্গে হুগলির পবিত্র ফুরফুরা শরীফের কিছু মানুষজন আছেন। তাই কি এই দলটিকে সাম্প্রদায়িক বলে আমরা দাগিয়ে দেব? যে দলে আদিবাসী, তপশিলি জাতি ও উপজাতির মানুষজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে আছেন এবং তাঁদের বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলোকে সংগঠিত করে যেখানে ফ্রন্টটি তৈরি হয়েছে, সেই রকম একটি দলকে কিভাবে আমরা সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত করতে পারি? বামপন্থীদের ভেতরে এই বিভ্রান্তিকে অত্যন্ত সুকৌশলে আর এস এস তার সামাজিক প্রযুক্তির মাধ্যমে ঢুকিয়ে দিয়েছে। বহু বামপন্থী মানুষ এই বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছেন।

বামপন্থীরাও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পথে পা বাড়াচ্ছেন—এই অভিযোগ তাঁরা নিজেদের মধ্যে করতে শুরু করেছেন। কিন্তু একটিবারের জন্য তাঁরা এই প্রশ্নের মুখোমুখি করছেন না প্রশ্নকর্তাদের যে, আব্বাস সিদ্দিকী কোন জায়গায় সাম্প্রদায়িক? আব্বাস সিদ্দিকী ব্রিগেডে বা পরবর্তী যে সমস্ত বক্তৃতাবলী করেছেন, তার কোনো জায়গায় কি কোনো রকম সাম্প্রদায়িক কথাবার্তা রয়েছে? কোনরকম সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ি রয়েছে? ধর্মীয় শব্দাবলী, যেগুলি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রতিটি সভায় প্রায়শই উচ্চারণ করেন, সে ধরনের একটি শব্দও কি আব্বাস তাঁর কোনো রকম বক্তৃতায় এই পর্যন্ত ব্যবহার করেছেন? তাহলে কিসের ভিত্তিতে আব্বাস সাম্প্রদায়িক? আব্বাসের একটি বক্তৃতার মধ্যে কি অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি কোনও ধরনের বিদ্বেষমূলক কথা, কোনও ধরনের প্ররোচনামূলক কথাবার্তা আমরা শুনতে পেয়েছি? তাহলে কিসের ভিত্তিতে আমরা তাঁকে সাম্প্রদায়িক বলছি?

যে রাজনৈতিক দলটির সব স্তরের কর্তা ব্যক্তি থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মী সমর্থক মানুষের রুটিরুজির প্রশ্নে কথা বলছেন, সমস্ত ধরনের মানুষের স্বাধিকারের কথা বলছে, সেটা ধর্মীয় সংখ্যালঘুই হোন, ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু এবং লিঙ্গভিত্তিক সংখ্যালঘু এবং আদিবাসী তপশিলি জাতি উপজাতি বা

এরপর ৪-এর পাতায়

ব্যাঙ্ক এবং বীমা বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে ধর্মঘট

চারটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক সরাসরি বিক্রির পথেই যাচ্ছে কেন্দ্র। ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র এই বিক্রির তালিকায় রয়েছে। আগে সরকার কয়েকটি বড় ব্যাঙ্ক সংযুক্ত করে শেয়ার বিক্রি করার পথ দেখছিল। কিন্তু নীতি আয়োগের পরামর্শ মেনে এখন সরাসরি বেসরকারি কর্পোরেটের হাতে এই চারটি ব্যাঙ্ক তুলে দেবার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলেই সূত্রের খবর। এ বছরের বাজেটে ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণ হাতে দেবার ইঙ্গিত দিয়েই রেখেছিলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। বিলগ্নি না খোলাখুলি বিক্রি, এই নিয়ে কিছু প্রশ্ন ছিল। এখন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক সিদ্ধান্ত নিয়েছে বেসরকারি সংস্থার হাতে এই চার ব্যাঙ্ককে তুলে দেওয়া হবে। এই প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে এবছরের এপ্রিলেই, চলবে ২০২২-র এপ্রিল পর্যন্ত। সামনের বছর এপ্রিলে এই চারটি ব্যাঙ্ক চলে যাবে বেসরকারি নিয়ন্ত্রণে। তবে বেসরকারিকরণের পালা এখানেই শেষ হবে না। ছ'টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার বিষয়ে আলোচনার পর্ব চলবে। সেই মর্মে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় খসড়া নোটও পেশ হয়েছে বলে খবর।

ব্যাঙ্ক বেসরকারিরণের লক্ষ্যে ব্যাঙ্কিং কোম্পানিজ (অ্যাকুইজিশন ও ট্রান্সফার) আইন এবং ব্যাঙ্কিং নিয়ন্ত্রণ আইনে সংশোধনী আনতে চলেছে কেন্দ্র। এই দুই আইন ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সময়ে করা হয়েছিল। বেসরকারিকরণের আইনি প্রক্রিয়া দ্রুত করতে সংসদের চলতি বাজেট অধিবেশনেই এই দুই আইনের সংশোধনী আনা হতে পারে।

এর আগে, ১০টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ককে চারটিতে সংযুক্তিকরণের ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ১২-তে এসে দাঁড়িয়েছে। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া ও ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অব কমার্সকে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ককে মেশানো হয়েছে কানাড়া ব্যাঙ্কের সঙ্গে। এলাহাবাদ ব্যাঙ্ককে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কে। অন্ধ্র ব্যাঙ্ক, কর্পোরেশন ব্যাঙ্ককে মেশানো হয়েছে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক-এ। বিজয়া ব্যাঙ্ক, দেনা ব্যাঙ্ককে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে ব্যাঙ্ক অব বরোদায়। স্টেট ব্যাঙ্কে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল পাঁচটি সহযোগী ব্যাঙ্ককে।

ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণ আসলে ব্যাঙ্কের বেসরকারিকরণ এবং ব্যাঙ্কে রাখা জনগণের বিপুল সম্পদ লুট করার নীল নক্শা। আসল লক্ষ্য ব্যাঙ্কগুলিতে গচ্ছিত ১২৭ লক্ষ কোটি টাকা কব্জা করা। এই বিপুল পরিমাণ আমানতের দুই-তৃতীয়াংশ গচ্ছিত আছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে। এই আমানতের ৮০ শতাংশের বেশি হচ্ছে ক্ষুদ্র আমানতকারীদের সঞ্চয়ের সমষ্টি। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পরে যেহেতু কোনও 'ব্যাঙ্ক ফেল'-এর ঘটনা ঘটেনি। কোনও বেসরকারি ব্যাঙ্ক দুর্বল হলে সেই ব্যাঙ্কের আমানতকারী ও কর্মচারীদের নিরাপত্তা দিয়েছে কোনও না কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক। তার ফলে সঞ্চয়কারীদের মনে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের প্রতি গড়ে উঠেছে গভীর আস্থা। কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য, সংযুক্তিকরণের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে ব্যাঙ্ক পরিষেবার অঙ্গন থেকে দূরে সরিয়ে আরও বেশি করে ফাটকা বাজারের দিকে ঠেলে দেওয়া। নির্বাচনী প্রচারে মানুষকে বামপন্থীদের বলতে হবে বিজেপি'কে ভোট দেওয়া মানে নিজের কষ্টার্জিত আমানত বিক্রির জন্য বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া।

ভয়ঙ্কর যে এফ আর ডি আই বিলটি বিজেপি এনেছে, তাতে বলেছে— ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়ে গেলেও সরকারের কোনো দায়িত্ব থাকবে না আমানতকারীকে টাকা ফেরত দেওয়ার। বেসরকারি ব্যাঙ্কে সরকারের কিসের দায়িত্ব। আর মালিক কর্পোরেট হাউস নিজেদের ব্যবসাতেই আমানতকারীর টাকা খাটাতে চাইবে এবং ঝুঁকি বাড়বে। অপরদিকে ওই বিলের তথাকথিত বরাভয়তো থাকবেই। কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তি দেয় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে ক্রমে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ বাড়ছে, প্রাইভেটে তা নয়। ঠিক, কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ বাড়ার জন্য তো কর্পোরেট হাউসগুলোই দায়ী, আর সেই সরকারী কাজে ঋণ পাওয়া বা না দেওয়ার হাত পর্দার পেছনে কাদের থাকে বুঝতে অসুবিধা হয় না।

যে চারটি ব্যাঙ্ক বিক্রির সিদ্ধান্ত হয়েছে তাদের কর্মী সংখ্যাও যথেষ্ট। ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ায় ৫০ হাজার কর্মী রয়েছেন। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে ৩৩ হাজার, ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্কে ২৬ হাজার, ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্রে ১৩ হাজার কর্মী রয়েছেন।

ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের কর্মী ও অফিসারদের সংগঠনগুলি ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণ ও কর্মী সংকোচনের বিরুদ্ধে ১৫-১৬ মার্চ ধর্মঘট ডেকেছেন। ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে এই বেসরকারিকরণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দীর্ঘদিনের নীতি লঙ্ঘন করবে। কোনও শিল্পগোষ্ঠী বা কর্পোরেটের হাতে ব্যাঙ্ক হস্তান্তর বা নতুন ব্যাঙ্ক খুলতে দেবার বিরুদ্ধে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চিরকালীন অবস্থান ছিল। আর্থিক কেন্দ্রীভবন আরও বাড়বে এবং ব্যাঙ্কে সঞ্চিত অর্থ অপব্যবহার হবে বলেই এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। এখন সরকারের চাপের মুখে রিজার্ভ ব্যাঙ্কও এই নীতি শিথিল করতে চলেছে।

একইভাবে মোদী সরকারের সময় একের পর এক আঘাত হানা হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা ক্ষেত্রের উপর। এল আই সি'র শেয়ার বিক্রিতে মরিয়া কেন্দ্র সরকার। ইতিমধ্যেই সংস্থার শেয়ার বিক্রির জন্য 'মার্চেন্ট ব্যাঙ্কার' নিয়োগ শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের অধীন 'ডিপার্টমেন্ট অব ফিনান্সিয়াল সার্ভিস' সংশোধনী বিল প্রস্তুতি শুরু করেছে। এলআইসি'র 'আইপিও' পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করবে 'ডিপাম', শেয়ার বিক্রির প্রক্রিয়ায় ইতিমধ্যেই 'ডেলাইট' এবং 'এসবিআই ক্যাপ' সংস্থাকে নিয়োগ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা সংস্থা এল আই সি'র মোট সম্পদের পরিমাণ এখন ৩২ লক্ষ কোটি টাকা বা চারশো চল্লিশ বিলিয়ন ডলার! অ্যাপেল, জেনারেল মোটরস বা এক্সন মোবিলের মতো সংস্থার মিলিত সম্পদের পরিমাণের থেকেও এল আই সি'র সম্পদ বেশি। এল আই সি'র গ্রাহক সংখ্যার পরিমাণ ৪০ কোটি, ভারত, চীন ও আমেরিকা বাদ দিয়ে পৃথিবীতে এমন কোনও দেশ নেই যার জনসংখ্যা এল আই সি'র গ্রাহক সংখ্যার চাইতে বেশি! এলআইসি'কে বাঁচাতে সংস্থার শ্রমিক কর্মচারীদের সঙ্গেই কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে লড়াই করছেন এল আই সি'র এজেন্টরাও। বিধানসভা ভোটে মানুষকে বুঝিয়ে বলতে হবে বিজেপিকে ভোট দেওয়া, মানে দেশের আর্থিক ক্ষেত্রগুলির বিক্রিবাট্টাকে ত্বরান্বিত করা। জয় শ্রীরাম আর হিন্দুত্বের কথা হলো বিজেপি'র বাইরের কথা আর ভেতরে হিন্দুত্বের আড়ালে রয়েছে দেশ বিক্রির অ্যাজেন্ডা।

একই সঙ্গে সাধারণ বীমা সংস্থাগুলির উপরেও চলছে আক্রমণ। মোদী সরকারের সময়েই বীমা ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে ৪৯ শতাংশ করা হয়েছে। ২০১৭ সালে নিউ ইন্ডিয়া ইনস্যুইরেন্স এবং জি আই সি ই সংস্থার বিলগ্নিকরণ করা হয়েছে, শেয়ার কিনতে বাধ্য করা হয়েছে এলআইসি'কে। দীর্ঘ দিন ধরে সাধারণ বীমা কর্মচারীদের দাবি চারটি সাধারণ বীমা সংস্থাকে সংযুক্ত করে এল আই সি'র মতো সাধারণ জীবন বীমা নিগম গড়ে তোলা হোক। ২১টি বেসরকারি বীমা সংস্থা থাকলেও এখনও দেশের সাধারণ বীমা ব্যবসার ৪২ শতাংশই রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা সংস্থাগুলির। স্বাস্থ্য বীমা ক্ষেত্রে ২১টি বেসরকারি সাধারণ বীমা সংস্থা ও ৭টি বেসরকারি স্বাস্থ্যবীমা সংস্থা থাকা সত্ত্বেও মোট স্বাস্থ্য বীমা ব্যবসার ৪৮.১৫ শতাংশই চারটি রাষ্ট্রায়ত্ত সাধারণ বীমা সংস্থার। তবু ২০১৭ সাল থেকে সাধারণ বীমা সংস্থাগুলির বেতন চুক্তি বকেয়া রেখেছে সরকার। বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছে বিক্রি করা হবে একটি সাধারণ বীমা সংস্থা। যারা বলছে এরাজ্যে সরকারে আসলে তারা নাকি সোনার বাংলা গড়বে তারাই গত সাত বছরে দেশ ধ্বংস করেছে, প্রতিটা সম্পদ বিক্রি করেছে। নির্বাচনী প্রচারেও জোরালো ভাবে হাজির করতে হবে বেসরকারিকরণ বিরোধী সংগ্রাম। তাই পাঁচটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালেই আগামী ১৫ ও ১৬ মার্চ সমস্ত ব্যাঙ্ক কর্মচারী এবং আধিকারিকদের সংগঠন যৌথভাবে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। ১৭ মার্চ সর্বভারতীয় বীমা কর্মচারীরা বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে ধর্মঘটে শামিল হচ্ছে। এই ধারাবাহিক সংগ্রামের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ১৮ মার্চ ধর্মঘটে শামিল হচ্ছে এল আই সি'র সর্বস্তরের কর্মচারী এবং আধিকারিকরা। মোদীর মিথ্যা প্রতিশ্রুতির গালগল্প ভেঙে দিয়ে, সর্বস্তরের মানুষকে আগামী নির্বাচনে বিজেপিকে পরাজিত করবার ডাক দিয়েছেন ব্যাঙ্ক ও বীমা কর্মচারী ও আধিকারিকবৃন্দ।

ইউ টি ইউ সি'র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কম. অশোক ঘোষ ব্যাঙ্ক এবং বীমা বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে শ্রমিক কর্মচারী এবং আধিকারিকদের এই ধর্মঘটের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। শুধু সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্মচারীবৃন্দই নয় এই বেসরকারিকরণ দেশবাসীর জীবনে চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয় নিয়ে আসবে বলে মনে করেন তিনি। দেশের প্রতিটি মানুষ এই ধর্মঘটকে সমর্থন করবে বলে আশা প্রকাশ করেন কম. অশোক ঘোষ।

রাজনীতি থেকে রাজনীতিকে বিযুক্ত করবার ফ্যাসিস্ট কৌশল

৩-এর পাতার পর

অন্যান্য অনগ্রসর জাতি (ওবিসি) যাঁদের বলা হয়, সমস্ত ধরনের মানুষের অধিকারের কথা বলছে, সেই দলটিকে, দলের কর্মকর্তাদের কিভাবে আমরা সাম্প্রদায়িক বলছি?

ভারতের সংবিধানের সার্বাভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নটি কি সাম্প্রদায়িক? আব্বাস তো ভারতের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোকে বজায় রাখবার জন্য শপথ গ্রহণ করছেন। এই শপথের জন্য কি আমরা তাঁকে সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত করব? আব্বাস তো অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, কর্মসংস্থানের কথা বলছেন। শিল্পের কথা বলছেন। এইজন্য কি তাঁকে আমরা সাম্প্রদায়িক বলে অভিহিত করব?

এই রকম এক ভয়াবহ প্রবণতা মানুষকে রাজনীতি থেকে বিযুক্ত করে, এক ধরনের সাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনার ভেতর দিয়ে রাজনৈতিক ধারা উপধারাতে প্রবাহিত করার জন্য প্রচেষ্টা চলছে। এই প্রচেষ্টার সামাজিক প্রযুক্তির ভিতর দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বামপন্থীদের মধ্যে। এই প্রচেষ্টাটি ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে সক্রিয়ভাবে কর্মরত বামপন্থী মানুষজন সহ প্রগতিশীল চিন্তা চেতনায় বিশ্বাস করেন, এমন মানুষজনদের ভেতরে।

অতিবাম বলে যারা নিজেদের পরিচয় রাখেন, বিশেষ করে যে লিবারেশন গোষ্ঠী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে অসাম্প্রদায়িকতা খুঁজে পান, বিজেপিকে ঠেকানোর জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একমাত্র সক্ষম ব্যক্তি বলে মনে করেন, সেই সমস্ত ব্যক্তিরা আব্বাস সিদ্দিকী ঘিরে এমন ধরনের প্রচার করছেন যা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। লিবারাল বলে দাবি করা লোকেরা এই প্রচার পর্যন্ত চালাচ্ছেন যে, আব্বাস সিদ্দিকী যতখানি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আক্রমণাত্মক, বিন্দুমাত্র তিনি বিজেপি বা তাদের মূল মস্তিষ্ক আর এস এসের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক নন। একটা রহস্য কাহিনীর মতো তারা এই ধরনের প্রচার চালাতে শুরু করেছে যে, আব্বাস সিদ্দিকী নাকি বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দ্বারা নানা ধরনের ভাবে প্ররোচিত হচ্ছেন, এই ধরনের সঠিক খবর তাদের কাছে আছে।

এইরকম বিভ্রান্তি ছড়িয়ে তাঁরা কিন্তু একটা বড় রকমের সামাজিক মেরুকরণ তৈরি করে বামপন্থীদের ভিতরে ভয়াবহ বিভ্রান্তির ভিতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত বিজেপি এবং তার 'ছুপা রুস্তম' সহযোগী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সহযোগিতা করবার পথে চলেছেন। আমাদের এই অপচেষ্টা সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করাই এখন ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানকে রক্ষা করবার অন্যতম প্রধান কাজ হিসেবে উঠে আসছে। বিশেষ করে রাজনীতিকে যখন রাজনীতির বাইরে নিয়ে এসে একটা অদ্ভুত ধরনের কৌশলের ভেতর দিয়ে সাম্প্রদায়িকতাকে নতুন করে একটা কৌশল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন নির্বাচনী সংগ্রামে প্রয়োগ করার চেষ্টা চলছে, তখন সর্বশক্তি দিয়ে আমাদের এই প্রবণতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। না হলে সার্বিকভাবে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।

অতীতের মুসলমান প্রশাসকদের ধর্মান্তরকরণে গালগল্প নির্মাণ করে ফ্যাসিবাদের জমি তৈরী করছে সংঘ পরিবার

পার্থসারথি দাশগুপ্ত

ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকদের ইতিহাস নির্মাণের ধারাকে কিভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতেতিহাসের মধ্যযুগের ঘটনাবলীর মধ্যে ইসলাম বিরোধিতার তত্ত্ব আশ্রয় পেয়েছে; ডালপালা মেলেছে তা পূর্ববর্তী প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে (দ্র: ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকদের আঁতুড ঘরে হিন্দুত্ববাদীদের আদর্শের জন্ম)। হিন্দুত্ববাদী ছদ্ম জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব দাঁড় করাতে গিয়ে সংঘ পরিবার মুসলমান জনতাকে মধ্যযুগের ইতিহাসকে ইসলামিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে কয়েকটি অভিযোগের তিরে বিদ্ধ করে সংঘ পরিবার। প্রথমত, 'অপর' সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান জনতা বহিরাগত বলে এদেশে এরা এক হাতে কোরান অপর হাতে তরবারি নিয়ে ধর্মান্তরকরণ করেছে সেই ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কি-আফগান প্রশাসকদের কাল থেকে। দ্বিতীয়ত, মুসলমান প্রশাসকরা ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনকালের শুরু পর্যন্ত ধর্মান্তরকরণ এবং হিন্দু নারীদের বিবাহ করে মুসলমানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। তৃতীয়ত, মুসলমান প্রশাসকদের উদ্যোগে সমাজের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত ইসলামিক সংস্কৃতি আচারবিচার ভারতের ঐতিহ্যশালী হিন্দু সংস্কৃতিকে কলুষিত করেছে।

এই ধরনের অভিযোগের ভিত্তিতেই সংঘ পরিবার হিন্দুত্বনির্ভর ছদ্ম জাতীয়তাবাদের জঙ্গীতত্ত্বের আগ্রাসনে সংখ্যালঘু ভারতীয়দের 'অপর' চিহ্নিত করে দেশের বহুত্ববাদী জাতীয়তাবাদের ধারাকে ধ্বংস করে এক সংঘাতপ্রবণ মুসলমান জাতীয়তাবাদ বনাম হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদের বিষাক্ত পরিবেশ নির্মাণ করছে।

ধর্মান্তরকরণ :

এদেশে মুসলমান সম্রাটদের প্রশাসনিক আধিপত্যে নিয়ে আসেন প্রথমে দাস-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কুতুবুদ্দিন আইবক। ১২০৬ সাল থেকে তুর্কি-আফগান শাসন চলে ১৫২৬ সালে বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত করে তৎকালীন ভারতের উপর প্রশাসনিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করার কাল পর্যন্ত। মুঘল সম্রাটদের অর্থাৎ বাবরের বংশপরম্পরায় মুঘল শাসন চলে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের কাল পর্যন্ত। কারণ এর পরেই সরাসরি ভারতবর্ষ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রশাসনিক দখলে চলে যায়।

মুসলমান শাসকদের আমলে যদি এক হাতে কোরান অপর হাতে তরবারি নিয়ে ধর্মান্তরকরণ করা হত তবে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কাল পর্যন্ত সারা ভারতের জনসংখ্যার মাত্র ১৩-১৫ শতাংশ মুসলমান জনসংখ্যা হত না। এখনও ভারতে হিন্দুদের জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ। অর্থাৎ এত বছর ধরে জোর করে ধর্মান্তরকরণ করলে অবশ্যই মুসলমান জনসংখ্যার শতাংশ অনেক অনেক বৃদ্ধি পেত। একদা হিন্দুধর্ম বিশ্বাসীদের চাপে যেমন অহিন্দু ধর্মবিশ্বাসী বৌদ্ধরা জাপান, চিন কোরিয়াতে পরিযায়ী হয়েছিলেন, তেমনই ঘটত মুসলমান ধর্মবিশ্বাসীরা যদি জোর করে ইসলামে বিশ্বাসী নয়, এমন ধর্মাবলম্বী জনতাকে ধর্মান্তর করার জন্য চাপ দিত। অর্থাৎ প্রতিবেশী দেশগুলিতে হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী জনতা গিয়ে আশ্রয় নিত।

এক কথায় সংঘ পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, ইসলাম ধর্মের তাড়নাতেই ধর্মান্তরকরনের পাশাপাশি হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে, হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর চাপিয়ে দিয়েছে মুসলিম প্রশাসক এবং সম্রাটরা। প্রশাসনিক বিশেষ করে, আর্থসামাজিক পরিসর থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুধুমাত্র ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে যে উন্মত্ততা সৃষ্টি হয়, সেই উন্মত্ত মেরুকরণের সুযোগ নিয়েছে বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার মিথ্যে ইতিহাস ভিত্তিক 'মিথ' থেকে। অযোধ্যার রামের জন্মভূমিতে হিন্দুদের প্রতিষ্ঠিত মন্দির ভেঙেই নাকি বাবরি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল!

আসলে মুসলিম শাসকদের দ্বারা মন্দির ধ্বংসের যেসব তথ্য ও কাহিনী হিন্দুত্ববাদীরা সত্য-অর্ধসত্য মিশিয়ে পরিবেশন করেন, তাও প্রধানত ইংরেজ ঐতিহাসিকদের ব্যাখ্যা থেকে গৃহীত। ইংরেজদের মহানুভবতা, ন্যায়বিচার ও সুদক্ষ প্রশাসনিক উদার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে মুসলমান প্রশাসকদের নিষ্ঠুর বর্বর শাসনব্যবস্থার তুলনা করে, ঔপনিবেশিক শাসনের 'হেজিমনি' অর্থাৎ আধিপত্যবাদী সম্মতি নির্মিত হয়েছিল। এমন নয় যে, এদেশে মন্দির লুণ্ঠন হয় নি। আফগান-তুর্কি শাসনের শুরুতে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে নয়, আর্থ-রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ ও সম্পদের সঞ্চয় করে মধ্য এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তার এবং সৈন্যবাহিনীর বেতন ও সাজসজ্জা এবং অস্ত্রশস্ত্রের নিয়মিত ব্যবস্থা করার প্রয়োজনেই এই লুণ্ঠন।

প্রসঙ্গত একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভারতবর্ষে হিন্দু রাজরাজরা বা মুসলমান সুলতানেরা কেউ সেভাবে ইউরোপের গীর্জার যাজকতন্ত্রের মতো প্রশাসনের উপরে মন্দির মসজিদের প্রভাব মেনে নেন নি। মন্দিরগুলো কোনো বিশেষ রাজার সার্বভৌমত্বের প্রতীক ছিল বলেই কোনো বিশেষ রাজাকে অপমানিত বা অবদমিত করার লক্ষ্যে পরাজিত রাজার মন্দিরগুলো ধ্বংস এবং লুণ্ঠন করতেন হিন্দু রাজারাও। আর বৌদ্ধ সংঘগুলি ধ্বংস করার ইতিহাসতো হিন্দু রাজাদের স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্ম ছিল। মুসলমান প্রশাসকদের রাজত্বেও যাজকতন্ত্র বা ইসলামিক ধর্মপ্রচারকদের কোনো সংগঠিত প্রভাব প্রশাসনের উপর কখনো স্থাপিত হয় নি। বরঞ্চ বলা যায় উলেমা রাষ্ট্রের বদান্যতায় টিঁকে থাকত। ইসলামিক নামকরণে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রপ্রধান সহ আমলাবর্গ ভূষিত হলেও এদেশে ইসলামিক রাষ্ট্র কখনই প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

ঘটনাক্রমে ১২৫৮ সালে তুর্কির 'খিলাফত প্রতিষ্ঠান' তৎকালীন সময়ের জন্য অকেজো হওয়ার ফলে রাষ্ট্রের ওপর ধর্মীয় প্রাতিষ্ঠানিক মিশনারী প্রভাব কার্যত শেষ হয়ে গেল। ঐতিহাসিক হরবন্স মুখিয়া দেখিয়েছেন যে, তুর্কি-আফগান সুলতানদের শাসনে স্থানীয় ব্যক্তিদের ধর্মান্তরকরণের দৃষ্টান্ত সেভাবে মেলে না। উলেমার বক্তব্য ছিল জলে নুনের মতো ধর্ম মিশে থাকবে; যদি জল নুন গ্রহণ করে তো লবণাক্ত হবে। সেভাবেই ধীরে সুস্থে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ধর্মান্তরকরণ যদি হয় তো হবে। না হলেও ক্ষতি নেই।

শ্রেষ্ঠ তুর্কী-আফগান শাসক আলাউদ্দীন খিলজী শরিয়তের বিধিবিধান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। শোনা যায় শুক্রবারের নামাজও নাকি পড়তে জানতেন না। তিনি প্রফেট মহম্মদের মতো চারজন অনুগত শিষ্যের মাধ্যমে নতুন ধর্মপ্রচারের ইচ্ছা পোষণ করতেন. আলাউদ্দীন খিলজি তাঁর প্রশাসনিক কাজকর্ম, রাজস্ব আদায় ইত্যাদি প্রসঙ্গে তাঁর নিযুক্ত কাজীদের পরামর্শ নিতেন। সুলতানি আমলে কখনই প্রশাসন এবং আর্থসামাজিক নীতির ক্ষেত্রে শরিয়তের খবরদারি ছিল না। শরিয়ত ছিল মূলত অন্যান্য ধর্মমতের সঙ্গে সহাবস্থানে ব্যক্তিগত আচরণের বিষয়। নাগরিক জীবনে শরিয়তের প্রভাব বিন্দুমাত্র পড়তে দেন নি, যদিও ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে শরিয়তের অনুশাসনের প্রভাব মেনে নিয়ে এক কৌশলী আর্থসামাজিক তথা সাংস্কৃতিক জীবনচর্যার অভ্যাস প্রচলিত হওয়ার শর্ত নির্মাণ করা হয়েছিল সুলতানি শাসনে।

এরপর আফগান-তুর্কী শাসন মুঘল সাম্রাজ্যের প্রশাসন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনভিত্তিক নীতি ব্যবহৃত হত। সাম্রাজ্য বিস্তারে, রাজস্ব সংগ্রহ, প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্য থেকে উদ্বৃত্ত সংগ্রহ, যুদ্ধ বিগ্রহ, রাজ্য দখল এমনকি ক্ষমতাদখলের জন্য হত্যা, প্রয়োজনে অ-ইসলামধর্মী আমলা ও অভিজাতদের রাষ্ট্রিক প্রশাসনের অঙ্গীভূত করা ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইসলামের ধর্মীয় প্রভাব বিস্তারের কোনো নীতিগত ভূমিকা মুঘল আমলেও প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

মুঘল আমলে ধর্মবিশ্বাস ও ইসলামিকরণ

বাবর মন্দির ধ্বংস করেছেন, একথা বলার পরেও হিন্দুত্ববাদীরা কিন্তু এইটুকু অন্তত স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, মুঘল বাদশাহ আকবর সর্বধর্ম সমন্বয়ে বিশ্বাস করতেন, ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর ভাবনাচিন্তায় ছিল অলীক সমন্বয়ী ধারা। তিনি গো-বধ বন্ধ করেছিলেন, জিজিয়া কর চাপান নি। আর যে ঔরঙ্গজেবের উপর 'যত দোষ নন্দ ঘোষের দায় চাপানো হয়', তিনি একুশ বছর একটানা শাসন করার পর জিজিয়া কর চালু করেছিলেন। আকবর নিজের ছেলে মুরাদকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য জেসুয়িট শিক্ষকদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। সম্রাট আকবর পারসি ভাষায় মহাভারত অনুবাদের প্রেরণা জুগিয়েছেন। আর ঔরঙ্গজেব যতগুলি মন্দির ধ্বংস করেছেন, তার থেকে বেশী সংখ্যক মন্দির প্রতিষ্ঠার লক্ষে যথাসম্ভব অনুদান দিয়েছেন। শুধু তাই নয় তাঁর সেনাবাহিনী আর আমলাতন্ত্রের মধ্যে পূর্ববর্তী বাদশাহদের তুলনায় অধিক সংখ্যক অ-মুসলমান নিযুক্ত করেছিলেন। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নাদীম রেজাভি এবং ইরফান হাবিব, তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের মতো ঐতিহাসিকরা পরিবেশন করেছেন, যাতে প্রমাণ হয় যে, প্রশাসনিক তথা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই ছিল ঔরঙ্গজেবের মূল উদ্দেশ্য। মুসলমানধর্মের প্রসার বা ধর্মান্তরকরণ নয়। তিনি মন্দির ধ্বংস করেছেন, প্রতিষ্ঠাও করেছেন প্রশাসনিক সামাজিক ও আমলাতান্ত্রিক স্বার্থে। জসওয়ান্ত সিংহের বিধবা স্ত্রী রানী হাদি রাঠোর ১৬৭৯ সালে একটি পত্রে ঔরঙ্গজেবের কাছে অনুরোধ করেছিলেন যে তাঁকে রাজটিকা দিয়ে শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত করলে তিনি রাজ্যের মন্দিরগুলো স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে গুঁড়িয়ে দেবেন। পত্রপাঠ ঔরঙ্গজেব রানীকে বিরত করেছেন।

মুঘল আমলে দুটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিবাহ প্রচলিত ছিল। আকবর হিন্দু রানীদের ধর্মান্তর করেন নি। শাহজাহানের শাসনকালে কাশ্মীর অঞ্চলে হিন্দু-মুসলিম বিবাহ সাধারণ প্রথা হিসেবে স্বীকৃত ছিল। শাহজাহানের আপত্তি সত্ত্বেও অমুসলমান স্ত্রীদের মৃত্যুর পর স্বামীর ধর্মীয় সংস্কার অনুসারে কবর দেওয়া হত। ঐতিহাসিক গবেষকবৃন্দ মধ্যযুগে ধর্মান্তরকরণের সেই ধরনের প্রশাসনিক প্রমাণ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সুদীর্ঘ ৭০০ বছরে বর্তমান ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান সহযোগে এই বিশাল ভূখণ্ডে মাত্র ১২-১৩ শতাংশ মুসলমান জনসংখ্যার স্বাভাবিকভাবেই কোরান ও তরবারির যোগসূত্রে ধর্মান্তরকরণের সাক্ষ্য পাওয়া যায় না, যতই না 'লাভ জেহাদে'র গল্প শোনাক না কেন উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংঘ পরিবার এবং বিজেপি। আরো কয়েকটি আকর্ষণীয় মুসলমান-জনসংখ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন সময়ান্তরে প্রবণতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। মুসলমান প্রশাসকদের প্রত্যক্ষ প্রশাসনিক এলাকার কেন্দ্র, অর্থাৎ আগ্রা দিল্লী এবং ঐ সব নগরের উপান্তের তুলনায় সুদূর কাশ্মীর, কেরালা, বাংলা প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত যথেষ্ট বেশি ছিল। শুধু তাই নয়। মুসলমান প্রশাসকদের সময়কালের তুলনায় ইংরেজ প্রশাসকদের রাজত্বকালে মুসলমান জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে অর্থাৎ কম করেও ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

ইসলাম ধর্মের রীতিনীতি ও প্রভাব সম্পর্কিত বিষয়ে গবেষক রাজিউদ্দীন আকুইল ব্যাখ্যা করেছেন যে সাধারণত ইসলামিক প্রশাসকদের আধিপত্য যদি কোনো অ-মুসলমান কাফের মেনে না নেন তবে হয় তাকে ইসলামধর্মে ধর্মান্তরকরণ করা হবে, নয় তো তাঁকে প্রকাশকের এলাকা থেকে বহিষ্কার করা হবে। এই সব বিধর্মী কাফেরদের বিরুদ্ধাচরণকেই চিহ্নিত করা হয় জেহাদ বলে। আবার ইসলাম ধর্মে লেখাপড়া জানা শিক্ষিত এবং গ্রন্থ রচনাকার বিদ্বজ্জনকে 'অহিল-ই-কিতাব' বলে সম্মানিত করে তাঁদের নিজস্ব ধর্মাচরণের সুযোগ দেওয়া হয়। আরববাসীরা যখন সিন্ধ এবং সংলগ্ন অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল তখন হিন্দুদের নিজস্ব বর্ণমালা সহ অজস্র কাব্য এবং মহাকাব্যের ঐতিহ্য থাকার জন্য তাঁদের প্রতি মুসলমান প্রশাসকদের জেহাদের আইন শিথিল হয়। ধীরে ধীরে সহাবস্থানের সামাজিক নীতি পরবর্তীকালে সুফী ধর্মের প্রসারের প্রভাবে ব্যাপক অঞ্চলে প্রসারিত হয়।

অথচ হিন্দুত্ববাদীরা উগ্র ইসলামবাদীদের মতই ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকদের তত্ত্বেই তাঁদের তত্ত্বের লালনপালন করেছেন বলেই অতীতের ঐসব সুচেতনাবোধে ঋদ্ধ হয়েছে ও বহুত্ববাদী প্রশাসনিক আচরণের ইতিহাসকে বিকৃত করছে। ধর্মান্তরকরণ আইনের বাহানা হিসেবে মন্দির ধ্বংস, ধর্মান্তরকরণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির অপ্রাকৃত ইসলামিক হার ইত্যাদি গল্পের বিষ ছড়িয়ে আমাদের বহুত্ববাদী সংবিধানের গায়ে কালি ছিটিয়ে দিচ্ছে হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিবাদী শক্তি।

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন

১-এর পাতার পর

করে তুলেছে। দেশের মানুষে মানুষে অবিশ্বাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে অনৈতিক এক বোধ চারিয়ে দিয়েছে বহুসংখ্যক দেশবাসীর মধ্যে।

মোদী সরকার অবশ্যই ক্রমাগত ষড়যন্ত্র নির্ভর। দেশ বিদেশের ধনপতিদের মুনাফালালসা চরিতার্থ করতে সর্বরকম অন্যায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে চলেছে। ভারতের মতো বিপুল জনসংখ্যার দেশের প্রতি আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের বিশেষ নজর। বড্ড লোভনীয় বাজার হয়ে উঠতেই পারে।

নয়া উদারবাদী প্রকল্পগুলির বাস্তব প্রয়োগে যেমন বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকে চিলি এক প্রকৃষ্ট গবেষণাগারে পরিণত হয়েছিল অগুস্ত পিনোশের নৃশংস স্বৈরাচারী শাসনের মাধ্যমে, সেই কায়দাতেই বর্তমান সংকটদীর্ণ পুঁজিবাদ ভারতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে এক দুর্বৃত্তনির্ভর স্বৈরশাসনের পত্তন ঘটাতে সুদূর ২০১৪ সাল থেকেই তৎপর। নরেন্দ্র মোদী তাদেরই নির্দিষ্ট কর্মসূচি একনিষ্ঠভাবে বাস্তবায়িত করে চলেছেন।

২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গের মতো একটি বাম আন্দোলন প্রভাবিত রাজ্যে যেভাবে মমতা ব্যানার্জীর মতো এক নীতি-নৈতিকতা বর্জিত স্বৈরাচারীর মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে জনগণের ওপর স্বৈরশাসন জারি করা হয়েছিল তা, এখন সপাটে চালু হয়েছে সমগ্র দেশব্যাপী। নরেন্দ্র মোদী এক নৃশংস স্বৈরশাসক যাঁর মাধ্যমে দেশ বিদেশের আগ্রাসী পুঁজিবাদ তাদের প্রার্থিত সমস্ত প্রকল্পগুলি নির্দ্বিধায় প্রয়োগ করে চলেছে। দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী-কৃষক-যুব ছাত্র-নারী সমাজ চরম অনিশ্চিতির শিকার। শ্রমজীবী অংশের কোটি কোটি মানুষের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা সম্পূর্ণভাবে বরবাদ করে ফেলে নৃশংসপন্থায় পুঁজিবাদী স্বৈরশাসন যা, ফ্যাসিবাদের নামান্তর মাত্র এদেশের বুকে চেপে বসেছে।

জাতপাত ও ধর্মবিশ্বাস ভিত্তিক বিভাজন সাধারণ মানবসমাজকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে গৈরিক সেনা নামক দুর্বৃত্তদের মাধ্যমে অবিরত ভীতি উৎপাদন করা চলেছে। অগণন মানুষের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে দেশের মাটি।

উত্তর ভারতের নানা অংশে সাধারণ আইনশৃংখলা বিপর্যস্ত। নারী নিগ্রহ ধর্ষণ, নৃশংস হত্যা চলেছে নির্বিচারে। সমগ্র নারী সমাজকে মনুস্মৃতি নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গিতে অবনমিত করে ফেলা হচ্ছে। প্রতিবাদ প্রতিরোধের যে কোনও প্রচেষ্টাকে দেশদ্রোহিতা বলে কঠোর আক্রমণাত্মক আচরণ করছে বিজেপি সরকার। ১৯৩৩ সালে জার্মানীর হিটলার কিংবা তারও আগে থেকে ইতালির বেনিতো মুসোলিনি যে কায়দার নিপুণ ব্যবহারের মাধ্যমে সেইসময়কালে সমস্ত ধরনের মানবিক বোধের বিলয় ঘটিয়েছিল, তেমন পদ্ধতিই নরেন্দ্র মোদী বা মমতা ব্যানার্জী নির্বিষ্ট চিত্তে অনুসরণ করে চলেছেন। এক অভূতপূর্ব সংকটে ভারতের সামাজিকবোধ।

বহুসংখ্যক আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করতে উদগ্রীব নীতিহীন রাজনৈতিক নেতা কর্মীর সহায়তায় মোদী তাঁর অপরাধী কেন্দ্রিক নিষ্ঠুর শাসন চাপিয়ে দিচ্ছেন ভারতের মতো একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত দেশের প্রায় সর্বত্র। মমতা ব্যানার্জী যেমন ক্ষমতা দখলের পরেই এই রাজ্যে বিরোধী শূন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু করতে অন্যসব রাজনৈতিক দলের বহুসংখ্যক রাজনৈতিক নেতা যারা, বেশ্যাবৃত্তি করতে দ্বিধান্বিত নয় তাদের, তৃণমূল কংগ্রেসে সামিল করেছিল, ঠিক সেভাবেই নরেন্দ্র মোদীর দল বিজেপি ভারতের বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী রাজনীতিকদের সামিল করে সম্পূর্ণ বিরোধীশূন্য ফ্যাসিবাদসম অপশাসন চালু করতে বদ্ধপরিকর। এর অবসান সহজেই হবার নয়।

প্রচলিত বোধের নৈতিকদিকগুলি বজায় রেখে অন্যভাবে ভাবতেই হবে। ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াই-এর অভিজ্ঞতা আমাদের নেই। সেকথা স্মরণে রেখেই পথ চলার নতুন নতুন পরীক্ষামূলক পথের সন্ধান করতে হবে। উন্নাসিকতা যেন আমাদের বাস্তববোধকে আচ্ছন্ন করে না ফেলে সেদিকে সযত্ন নজর রাখা বিশেষ জরুরি।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের উল্কাসম উত্থান যেমন এই রাজ্যে ন্যূনতম গণতান্ত্রিক পরিবেশকে নিরবচ্ছিন্নভাবে কলুষিত করেছে, তা-ই ২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীর জয় সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। বহুসংখ্যক উদাহরণ যোগে লক্ষ করা অসম্ভব নয় যে, নরেন্দ্র মোদী ও মমতা ব্যানার্জীর সরকার উভয়েই একই কর্মধারা অনুসরণ করে চলেছেন। এমনকি, সাম্প্রদায়িকতার অশুভ বিস্তার পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের মতো একটি অগ্রসারী সমাজ-মানস সমৃদ্ধ রাজ্যেও বিস্তারলাভ করেছে। মমতা ব্যানার্জীর প্রধান অপরাধ, তিনি ১৯৯৮ সাল পরবর্তী সময়ে স্বীয়কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় বিজেপি'র মতো একটি আদ্যন্ত বিষাক্ত জনবিরোধী রাজনৈতিক অপশক্তিকে পশ্চিমবঙ্গে ঠাঁই দিয়েছেন। তিনি সামান্যতম নীতি আদর্শ পর্যন্ত বর্জন করে এই রাজ্যে উগ্র সাম্প্রদায়িক জঙ্গি হিন্দুত্ববাদ নির্ভর অতিজাতীয়তাবাদী বোধ পরিব্যাপ্ত করতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘকে নিশ্চিত সহায়তা দিয়েছেন।

ভারতের দীর্ঘস্থায়ী স্বাধীনতা সংগ্রামে আর এস এস বা তৎকালীন সময়ে বর্তমান বিজেপি'র পূর্বসূরি হিন্দু মহাসভা বা জনসংঘ পশ্চিমবঙ্গে প্রভাব বিস্তারে ব্যর্থ হয়েছিল। পরবর্তীকালে জনসংঘ নামক দলটিও প্রদীপ চিহ্ন নিয়ে প্রবল প্রচার করলেও এই রাজ্যের জনমানসে সামান্যতম প্রভাবও বিস্তার করতে পারেনি। রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার প্রসার ঘটাতে দ্বিখণ্ডিত স্বাধীন দেশে হিন্দু-মুসলমান রক্তক্ষয়ী সংঘাতে লক্ষ লক্ষ বাস্তুচ্যুত নিঃসহায় উদ্বাস্তুদের মনে মুসলিম বিরোধী স্বাভাবিক আবেগকে কাজে লাগিয়েও আর এস এস ব্যর্থ হয়েছিল।

এই রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দুকূলপ্লাবী অভিঘাতে সাধারণ মানুষ প্রকৃত শত্রুদের চিহ্নিত করতে ভুল করেনি। কখনও সখনও দু'একটি বিধানসভা আসনে জয় পেলেও জনসংঘ বা বিজেপি কোনও তাৎপর্য বহন করেনি। পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ ৩৪ বছরের বাম শাসনে সাম্প্রদায়িক ভেদভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করতে না পারলেও এই অপশক্তিকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছিল।

দুর্ভাগ্যের দেশভাগ এক সময় বাংলাভাষী মানুষদের ব্যাপক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত করলেও সেই নির্যাতিত জনগোষ্ঠী পূর্বাপর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপূর্ণ আচরণে প্ররোচিত হননি। সদ্যপ্রতিষ্ঠিত তৃণমূল কংগ্রেস সরকার এই রাজ্যের সেই উন্নত সমাজ-মননকে ধ্বস্ত করেছে। ১৯৯৮ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজেপির সঙ্গে জোট বেঁধে দুটি লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী জয়ী হন। প্রথমবার এমন অঘটন ঘটে মমতা ব্যানার্জীর মতো এক অবিমৃশ্যকারী উচ্চাকাঙ্ক্ষী নেত্রীর বদান্যতায়।

পরবর্তীকালে ২০১১ সালে বিপুল অর্থবল এবং অনেকগুলি গণমাধ্যমকে নিপুণভাবে ব্যবহার করে এবং জাতীয় কংগ্রেস সহ এস ইউ সি'র মতো ঘোষিত বামপন্থীদল এবং জামায়েত-এ-উলেমা হিন্দ নামক একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সমন্বিত করে এক রামধনু জোট রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষমতা দখল করে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পরিত্রাতা হিসেবে স্বয়ং মমতা ব্যানার্জী অবতীর্ণা। প্রতিশ্রুতি দেদার। বাস্তবে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকারগুলি নির্মমভাবে অবহেলিত হয়ে চলে। কিন্তু, মোনাজাতের ভঙ্গিমায় নেত্রীর মুখচ্ছবি সারা রাজ্যে সরকারী অর্থে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এক নেত্রীর মাহাত্ম্য প্রচার চলে রাজ্যের করদাতাদের অর্থে। এক টাকা দু'টাকা নয়। বহু কোটি টাকা।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের জন্য সদর্থক কিছুই হল না। কিন্তু এ ধরনের প্রচারের ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর একাংশের মধ্যে আর এস এস বা তাদের শাখা সংগঠনগুলির প্রচারকরা বিরূপ প্রচারের রসদ পেয়ে গেল সহজেই। বিশেষ করে রাজ্যের হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী পশ্চাদপদ মানুষদের সমস্ত অপ্রাপ্তির জন্য মুসলমান তোষণের মনগড়া অভিযোগটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকল। আর এস এস-এর মতো একটি উগ্র হিন্দুত্ববাদী হিংস্র সংগঠন নব উদ্যমে পশ্চিমবঙ্গে নতুন নতুন শাখা গড়ে তুলেছে এই মেকী বা অলীক ভীতি উৎপাদন করেই। আর এস এস-এর মূল শত্রু। অবশ্যই বামপন্থীরা বা মার্কসবাদীরা। তারপরেই তো মুসলমান ও খ্রিস্টান ধর্মের মানুষরা। তাদের অস্তিত্ব নাশ করাকেই এরা পবিত্রতম কর্তব্য বলে মনে করে। এমন অভিযোগও অনেকে করেন যে স্বয়ং মমতা ব্যানার্জীর (যাঁকে আর এস এস দেবী দুর্গার অবতার বলে উল্লেখ করেছিল) সঙ্গে নিবিড় বোঝাপড়ার মাধ্যমেই আর এস এস পশ্চিমবঙ্গে তাদের সাংগঠনিক শক্তির বিস্তার ঘটিয়েছে। অমূলক বলা যাবে না।

এ প্রসঙ্গটি বহুবার উচ্চারিত হয়েছে মমতা ব্যানার্জী বা তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতো রাজনৈতিক দল তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপি'র মতোই দেশের সংবিধানের অন্যতম প্রধান মর্মবস্তু 'ধর্ম নিরপেক্ষতা'র নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়। বিজেপি বা আর এস এস-এর সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা প্রতিযোগিতা সর্বদা বিদ্যমান। একপক্ষ সশস্ত্র মিছিল করে রামনবমী (যা পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির সঙ্গে আদৌ সম্পর্কিত নয়) পালন করে অন্যদল হনুমান বা বজরংবলীর নামে ধর্মীয় আবেগ উস্‌কে দেয়। বামফ্রন্ট সরকার পরিচালনা কালে এসব কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না। রাষ্ট্র পরিচালনার সঙ্গে ধর্মের সম্মিলন কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হয়নি। দীর্ঘ চৌত্রিশ বছরে রাজ্যের দু'জন মুখ্যমন্ত্রী কম. জ্যোতি বসু বা কম. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে কোনও মন্দির মসজিদ গির্জা বা মাজারে গিয়ে তাঁদের ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচয় দিতে হয়নি। অন্যান্য সমস্ত মন্ত্রীদের প্রায় সকলের ক্ষেত্রেই এই গুণাবলী দেখা গেছে। কোনও কাট-আউট কখনও কোনও রাস্তার মোড়ে দেখা যায় নি। এসব মমতা ব্যানার্জীই রাজ্যে আমদানি করেছেন। এ সবের ফলস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে সাম্প্রদায়িক বোধ নয়াভাবে বেশ কিছুসংখ্যক মানুষকে প্রভাবিত করেছে।

সাম্প্রদায়িক বোধের ক্রমবিস্তৃতি সাংগঠনিক ক্ষেত্রে বিজেপি'র মতো একটি অপশক্তিকে সংহত হবার সুযোগ করে দিয়েছে। ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনে লক্ষ করা গেল রাজ্যের সমাজ সংস্কৃতির বিপরীত মেরুতে অবস্থিত বিজেপি ১৮টি লোকসভা আসনে জয়লাভ করে নরেন্দ্র মোদীর মতো এক স্বৈরশাসকের পক্ষে চলে গেল। এসব তো পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিবেশে কল্পনাও করা যেত না। বর্তমানকালে ঐ অপশক্তি রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে অন্যতম প্রধান শক্তি হিসেবে মুখব্যাদান করতে উঠে পড়ে লেগেছে। প্রত্যক্ষভাবে বিজেপি'র সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের গোপন আঁতাতের কথা বাদ দিলেও এই কার্যকারণ সম্পর্ককে অস্বীকার করার কোনও সঙ্গত কারণ নেই। কিছুকাল যাবৎ যে বহুসংখ্যক তৃণমূলী অনায়াসে বিজেপি'র সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংশ্রব গড়ে তুলেছে তার অন্যতম কারণও মমতা ব্যানার্জীর নীতি আদর্শহীন পথ চলা। সারদা, রোজভ্যালি প্রভৃতি অনর্থসৃষ্টিকারী চিটফান্ডগুলির প্রতারিতদের কোনও সুবিচার বা তাঁদের গচ্ছিত অর্থ ফেরৎ দেবার সামান্যতম ব্যবস্থাও হয়নি। মানুষের চোখের সামনে লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ নেওয়া তৃণমূল নেতা নেত্রীরাও নিরাপদ। সিবিআই এবং ইডি মোদী সরকারের হাতের পুতুল। মোদী মমতা গভীর বোঝাপড়া করেই চলেছে। জনগণ সুবিচার পাচ্ছে না। দীর্ঘ সাত বছর ধরে এক অদ্ভুত অবস্থা।

সারা দেশের ক্ষেত্রে যেমন কোটি কোটি মানুষ কর্মহীন হয়ে হতাশার অন্ধকারে, তেমনভাবেই পশ্চিমবঙ্গেও সসম্মান জীবিকা অর্জনের সামান্যতম সুযোগও হারিয়ে গেছে। রাজ্যের শিক্ষিত যুবক-যুবতীরাও বাধ্য হয়ে অন্য রাজ্যে। আর কমশিক্ষিত মানুষরা অদক্ষ বা দক্ষ শ্রমিক হিসেবে 'পরিযায়ী' বা প্রবাসী শ্রমিকে পরিণত। রাজ্যের লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করে শিল্পসম্মেলন হয়েছে অগুণতি। মুখ্যমন্ত্রীর প্রগলভ ভাষণ শোনা গেছে আর শিল্পপতিদের অনেকে মমতা-বন্দনা করেছেন। গানবাজনা হয়েছে। কিন্তু, বিগত দশ বছরে কোনও শিল্পই রাজ্যে গড়ে ওঠে নি। অন্ধকার আরও গভীর হয়েছে। সিঙ্গুরে টাকা কোম্পানির বিশাল নির্মাণ গুঁড়িয়ে দিয়ে সেখানে মমতা ব্যানার্জী সরষের বীজ ছড়িয়ে এসেছিলেন। তিনি এখন ভোটের আগে আবার নাটক করছেন সিঙ্গুরে শিল্প হবে বলে।

পশ্চিমবঙ্গে ২০১১ সাল থেকেই অসংখ্য বাম নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কেস দিয়ে তাঁদের অনেককেই কারাগারে বন্দি করা হয়েছে। বহু নাটক হয়েছে। বেশ কয়েকজন নামজাদা সি পি আই (এম) নেতাকে গ্রেপ্তার করে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছিল। সর্বক্ষেত্রেই প্রমাণিত হয়েছে এবং হচ্ছে যে, ঐসব অভিযোগ নিতান্তই মনগড়া, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং নির্জলা মিথ্যা। বাম নেতা কর্মীদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। এখনও বহু হাজার বাম কর্মী গৃহহীন। তাদের গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। প্রাণসংশয়ের ভীতি এখনও অহরহ ছড়ানো হচ্ছে। ইত্যবসরে গ্রামবাংলায় সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার অপহরণ করে চোর ও দুর্নীতিবাজদের মাধ্যমে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা জবরদখল হয়ে গেছে। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, নরেন্দ্র মোদী মমতা ব্যানার্জীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই সারা দেশে গণতন্ত্র ধ্বংস করে চলেছেন।

এমন আরও অসংখ্য ঘটনার উল্লেখ করে বোঝানো সম্ভব যে, নরেন্দ্র মোদী তাঁর উত্থানকাল থেকেই স্বৈরাচারী ও ফ্যাসিবাদী পথে চলতে বদ্ধপরিকর। বাংলার 'নিজের মেয়ে' বলে ইদানিং বিজ্ঞাপন দেওয়া মমতা ব্যানার্জীও ঠিক একই রকম স্বৈরশাসনে প্রথম থেকেই উদ্যোগী। উভয়েই গণতন্ত্র নিধন করে এক ধরনের ফ্যাসিবাদী কায়দায় চলতে একান্তভাবে আগ্রহী। উভয়েই দেশ ও রাজ্যের সাধারণ মানুষের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় চূড়ান্ত অমানবিক আচরণে নিবদ্ধ। এই উভয় অপশক্তির একটিকে সঙ্গে নিয়ে দেশে 'ফ্যাসিবাদ' বিরোধী বা 'উগ্র সাম্প্রদায়িক' হিন্দুত্ববাদ বিরোধী গণআন্দোলন সফল হতে পারে না। সুতরাং প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক বোধসম্পন্ন সমস্ত সৎ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই দুই অপশক্তিকে বিনাশ করতেই হবে। কোনও গত্যন্তর নেই। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সমস্ত কেন্দ্রে সংযুক্ত মোর্চা প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করেই দেশ এবং রাজ্যকে বাঁচানো সম্ভব।

মন্দার বাজারে ব্যাঙ্ক ও বিমা সংস্থা বেসরকারিকরণের আসল মতলবটা কী?

জাতীয় সম্পদ বিক্রি করে পাঁচ লক্ষ কোটি টাকা সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এবারের কেন্দ্রীয় বাজেট ঘোষণায় জানা গেল, দু'টি জাতীয় ব্যাঙ্ক এবং একটি বীমা সংস্থার বেসরকারিকরণ হবে। মাথায় রাখতে হবে ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের ভাবনাটা ২০১৪ সালে কংগ্রেসী জমানাতেই শুরু হয়েছিল এবং মোদী জমানাতে এই ভাবনা বাস্তবায়িত করার জন্য তোড়জোড় শুরু হয়েছে।

প্রসঙ্গত ব্যাঙ্ক ব্যবসার সিংহভাগ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের দখলে থাকলেও গত দু'দশকে ধার দেওয়ার নিরিখে বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলির গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে। ২০১৪ সালে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির পরিচালনা কাঠামোর পুনর্মূল্যায়নের জন্য যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল সেই কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছিল, ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসা বর্তমান ধারার বদল না হলে ২০২৫ সাল নাগাদ বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলির ব্যবসার বিস্তার প্রভূত পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

পাশাপাশি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির বাজার ক্রমশ সঙ্কুচিত হবে। পুনর্মূল্যায়ন কমিটির তরফ থেকে বলা হয়েছিল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের তুলনায় বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলি বেশি লাভজনক। তুলনামূলকভাবে আমানত প্রতি বেসরকারি ব্যাঙ্কে লাভের পরিমাণ বেশি।

ব্যাঙ্ক ব্যবসার অনাদায়ী ঋণের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি বিশেষ উদ্বেগের কারণ। তবে এক্ষেত্রে বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলির অনেক ভাল অবস্থায় আছে। পুনর্মূল্যায়ন কমিটির স্পষ্ট সুপারিশ ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির বেসরকারিকরণ না হলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির বোঝা টানতে টানতে সরকারই দেউলিয়া হয়ে পড়বে। চতুরতা ও ভন্ডামির অপূর্ব রসায়ন। আপাতদৃষ্টিতে এই যুক্তি মোক্ষম মনে হলেও, মনে রাখা প্রয়োজন সামাজিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির তুলনায় বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলিকে প্রায় কিছুই করতে হয় না, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির বহু শাখাই—বাণিজ্যিক অর্থে অলাভজনক হলেও সামাজিক অর্থে নয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির শাখা খোলা ছাড়াও কল্যাণকামী রাষ্ট্রের অংশ হিসাবে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে জনস্বার্থে এমন বহু কার্জ করতে হয় যেখানে লাভের প্রশ্নটা মুখ্য বিচার্য বিষয় হয় না। স্বভাবতই বেসরকারি ব্যাঙ্কের তুলনায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে লাভের পরিমাণ কম হওয়াটা আশ্চর্যের বিষয় নয়। তাই লাভের প্রশ্ন তুলে যখন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের বেসরকারিকরণের পক্ষে সওয়াল করা হচ্ছে, তখন কী ধরে নিতে হবে সামাজিক দায়বদ্ধতা পূরণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র তথা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা আগামী দিনে ক্রমশ গৌণ হয়ে পড়বে? রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির ক্রমবর্ধমান অনাদায়ি ঋণের পরিমাণ অবশ্যই বেশ উদ্বেগজনক, তবে অনস্বীকার্য বাস্তব ঘটনা, এই অনাদায়ী ঋণের বড় অংশটার জন্য কর্পোরেট সংস্থাগুলিই দায়ী। এই খারাপ ঋণগুলির দেওয়ার নির্দেশ অধিকাংশই আসে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের উপর মহলের নেতাদের কাছ থেকে। তোষামুদে পুঁজির জমানায় বড় বড় কর্পোরেট সংস্থাগুলির সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের 'দোস্তি' তো সুবিদিত ঘটনা। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করতে গিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির দফারফা করে—তাদের 'অলাভজনক' আখ্যা দিয়ে বেচে দেওয়ার অপচেষ্টা সমর্থনযোগ্য হতে পারে না।

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কথাটা এখনও বলা হয় নি। সুবিদিত ঘটনা, বর্তমানের করোনা আবহে মন্দায় আক্রান্ত সময়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে অনেক কম দামেই বিক্রি করবে সরকার এবং অতি মাত্রায় এই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির ক্রেতা হবে মোদী সরকারের পছন্দসই কর্পোরেট বৃহৎ সংস্থাগুলি। ব্যাঙ্ক কেনার পর ক্রেতা কর্পোরেট সংস্থাটি স্বাভাবিকভাবেই নিজের ব্যবসাতেই আমানতকারীদের টাকা খাটানোর চেষ্টা করবে। এবং অনেক ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগের সব দায় বহন করতে হবে আমানতকারীদেরই।

প্রসঙ্গত এফ আর ডি আই নামক যে ভয়ঙ্কর বিলের কথা শোনা গিয়েছে সেই বিল অনুযায়ী ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হলে বেসরকারি 'ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের টাকা ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে না।' তবু রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক হলে আমানতকারীদের টাকা ফেরৎ দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের কিছুটা দায়বদ্ধতা থেকেই যায়। এই মন্দার সময়েই ব্যাঙ্ক বিক্রির আসল উদ্দেশ্য হল এই সময় যতটা কম দামে তোষামুদে পুঁজির হাতে রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পদ তুলে দিতে দায় কর্পোরেট বান্ধব বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার—আর জনস্বার্থের প্রশ্ন? সে প্রশ্ন না তোলাই ভাল আপাতত। জাতীয় স্বার্থবিরোধী কাজ হতে পারে।

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারীদিবস উপলক্ষে নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘের জেলায় জেলায় কর্মসূচি পালিত হচ্ছে

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘের উদ্যোগে বিভিন্ন জেলায় কর্মসূচি পালিত হয়। সারা বিশ্বজুড়ে এই দিনটি মহাসমারোহে পালিত হয়। আমাদের দেশের সর্বত্রও এই দিনটি পালিত হয়। এবার এই করোনা আবহে আমরা ভয়ানক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে চলছি। লিঙ্ক ইন অপরচ্যুনিটি ইনডেক্সের সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে শুধু মহিলা বলেই ৮৫ শতাংশ কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার। করোনা সময়কালে সবচেয়ে বেশি কাজ হারিয়েছেন মহিলারা। ১৫-৫৯ বছর বয়সী মেয়েদের মধ্যে কেবলমাত্র ৯ শতাংশ কাজে নিযুক্ত। ২০০০ সালের পরবর্তী দশকে কর্মরত নারী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৩৪ শতাংশ। সেই হার বর্তমানে কমে দাঁড়িয়েছে ১১ শতাংশে। একই সঙ্গে পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিনের দাম বৃদ্ধি, গ্যাসের দাম লাগামছাড়া এবং তার ফলে সমস্ত জিনিসের আকাশছোঁয়া দাম বৃদ্ধির ফলে মহিলারা সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন। অন্যদিকে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির রমরমা, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা ও মহিলাদের মনুবাদের অনুশাসনে পিছিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা শাসকশ্রেণির বিশেষত সামনেই কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে হিংসার বাতাবরণ তৈরি করেছে রাজ্য জুড়ে, তা ভয়ংকর দুশ্চিন্তার। এর বিরুদ্ধে ৮ মার্চ নিখিলবঙ্গ মহিলা সংঘ জেলায় জেলায় কর্মসূচি গ্রহণ করে।

আলিপুরদুয়ার জেলায় আলিপুরদুয়ার কালচিনি সহ বিভিন্ন ব্লকে নিখিলবঙ্গ মহিলা সংঘের সদস্যারা মিছিল সমাবেশ অনুষ্ঠিত করে। সেখানে মদিনা কোম, রুমা ব্রাহ্মীণ সহ নেতৃবৃন্দ নেতৃত্ব দেন। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে আমাদের একটি বড় মিছিল ও সমাবেশ ৮ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মহুয়া চক্রবর্তী, কৃষ্ণা বসু ঠাকুর সহ কয়েকজন নেত্রী বক্তব্য রাখেন। দার্জিলিং জেলায় বামপন্থী মহিলা সংগঠনসমূহের মিছিল ও সমাবেশ হয়। সেখানে মিছিলের পুরোভাগে ছন্দা গোস্বামী সহ জেলা নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে ও তপনে সংগঠনের সংগঠিত মিছিল ও সমাবেশ হয়। সেখানে নেতৃত্বে ছিলেন রাজ্য সভানেত্রী কম. সুচেতা বিশ্বাস সহ চঞ্চলা ঘোষ, শিপ্রা সেন প্রমুখ নেতৃত্ব। মালদা জেলায় সুসংগঠিত ভাবে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে কম. তৃপ্তি পান্ডে সহ বিভিন্ন নেত্রী বক্তব্য রাখেন। এছাড়া নদীয়া জেলার রানাঘাট, কৃষ্ণনগর সহ বিভিন্ন অঞ্চলে মিছিল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে জেলা সভানেত্রী করবী সেন, ভবানী বর্মন, অঞ্জনা বিশ্বাস, জেলা সম্পাদিকা ছায়া রায় বক্তব্য রাখেন। উত্তর চব্বিশ পরগনার নৈহাটিতে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে শিখা ঘোষ, দুর্গা বসু সহ বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রাখেন। এছাড়া হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নিখিল বঙ্গ মহিলা সংঘের রাজ্য সম্পাদিকা কম. সর্বানী ভট্টাচার্য, কম. তপতী ভাদুড়ি, গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির কম. কনীনিকা ঘোষ সহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ। সভায় সভাপতি মণ্ডলীতে ছিলেন হুগলী জেলার মহিলা সংঘের সম্পাদিকা কম. চম্পা বসাক।

গোসাবা বিধানসভা কেন্দ্রে আর এস পি প্রার্থী কম. অনিল চন্দ্র মণ্ডলের মনোনয়ন পত্র পেশ

গত ১০ মার্চ গোসাবা বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য মনোনয়ন পত্র পেশ করলেন সংযুক্ত মোর্চা সমর্থিত আর এস পি প্রার্থী শিক্ষক কমরেড অনিল চন্দ্র মন্ডল। সুসজ্জিত মিছিল সহকারে মনোনয়ন পত্র পেশ করতে যান আর এস পি প্রার্থী কম. অনিল চন্দ্র মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন আর এস পি জেলা সম্পাদক কম. চন্দ্রশেখর দেবনাথ, সি পি আই এম নেতা কম. দীপঙ্কর শীল, কম.অরিন্দম মুখার্জী আর ওয়াই এফ সহ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কম. আদিত্য জোতদার সহ সংযুক্ত মোর্চার অন্যান্য নেতৃত্ব। অনিল বাবু গোসাবা আর আর ইনস্টিটিউট-এর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক।

তিনি এলাকার সংগঠনের সঙ্গে দলের শিক্ষক সংগঠনের নিয়মিত কর্মী। এলাকায় একজন সৎ, শিক্ষিত, ভদ্র মানুষ হিসাবেও যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে তাঁর। সারা পশ্চিমবঙ্গের সাথে সাথে গোসাবাতেও এবার ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে চলেছে। বেকারত্ব, তৃণমূল সরকারের লাগামহীন দুর্নীতি, আমফান সহ পঞ্চায়েতে লাগাতার দুর্নীতি, জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি, গোসাবাতে অস্ত্রের হদিস, বিজেপি'র দুষ্কৃতিদের বোমা বিস্ফোরণও, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিক্রি, সুন্দরবনের নদী-বাঁধের স্থায়ী সমাধান, পরিযায়ী শ্রমিকের দুর্দশা, দুই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি'র এবারের বিধানসভা নির্বাচনের মূল অস্ত্র। মনোনয়ন জমা দিয়ে কম. অনিল মণ্ডল বলেন—'বেকারের কর্মসংস্থান, সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নত করা, কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়ার দাবিতে ও গোসাবাতে শান্তি ফিরিয়ে আনতে আমাদের লড়াইকে আরও জোরদার করতে সংযুক্ত মোর্চাকে সমর্থন করার আহ্বান জানাচ্ছি"।

একশটি সরকারি ক্ষেত্র অবিলম্বে বিক্রির পরামর্শ দিচ্ছে নীতি আয়োগ

নীতি আয়োগ সম্প্রতি সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রকসমূহকে আগামী চার বছরে কোন কোন রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের সম্পূর্ণ বেসরকারিকরণ এবং বিলগ্নীকরণ করে প্রায় ৫ লক্ষ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে আয় করা যাবে, তার তালিকা তৈরি করতে সুপারিশ করেছে। এই বিষয়ে নীতি আয়োগের নয়াউদারবাদারে ধারকবাহক অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদগণ কোন কোন রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানিকে বেসরকারিকরণ বা বিক্রি করে দিলে যথেষ্ট আয় হবে, সেই বিষয়ে নিজেরাও বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে সরাসরি কথাবার্তা চালাচ্ছেন।

সেই লক্ষ্যে নীতি আয়োগ ইতিমধ্যেই প্রায় ১০০টি সরকারি সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত করেছে, যেগুলি বিক্রি করে অনায়াসে ৫ লক্ষ কোটি টাকা আয় হতে পারে। এই সব কোম্পানিগুলি প্রথম পর্যায়েই বিক্রি করা যেতে পারে বলে মনে করে নীতি আয়োগ। ১০টি বিভিন্ন মন্ত্রকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের মধ্যে আপাতত অন্তত ৩২টি সংস্থা বিক্রির ক্ষেত্রে এই মুহূর্ত থেকেই সরকার উদ্যোগ নিতে পারে বলে মনে করে নীতি আয়োগ। এই সব চিহ্নিত রাষ্ট্রীয় সম্পদ বা সরকারি ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে একগুচ্ছ জাতীয় রাজপথ, সমুদ্রবন্দর, সমুদ্রে অন্বেষণকারী ক্রুইজি টার্মিনাল, তেল এবং গ্যাসের পাইপলাইন, ট্রান্সমিশন টাওয়ার, রেলওয়ে স্টেশন, কয়েকটি মেট্রোর প্রযুক্তিনির্ভর পরিচালন ব্যবস্থা, পার্বত্য এলাকার রেলওয়ে, ওয়ারহাউসগুলি এবং বাণিজ্যিক কমপ্লেক্সসমূহ। এই সব সংস্থার অধীনে রিয়েল এস্টেট থাকলে সে সবও একটি ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সংস্থার পর্যবেক্ষণে নিয়ে আসা হবে যাতে এই সব রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলি কর্পোরেটদের হাতে বিক্রি করার প্রক্রিয়াটি মসৃণ হয়। যেসব জমিগুলি সমস্ত জটিলতা থেকে মুক্ত সেইসব সম্পত্তি যত শীঘ্র সম্ভব একটি ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সংস্থার দায়িত্বে নিয়ে আসা হবে সরাসরি রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট গঠন করা হবে দ্রুত। বিক্রির অর্থ সরাসরি সরকারি ট্রেজারিতে জমা করা হবে।

এভাবেই এক ভয়ঙ্কর আগ্রাসী কর্পোরেটবান্ধব অর্থনীতির কাছে দেশের মূল্যবান সম্পদ বিক্রির মাধ্যমে আত্মসমর্পণ করছে মোদি সরকার এবং তাদের পরামর্শদাতা আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের তাঁবেদার সংগঠন নীতি আয়োগ। মোদী যে উদ্দেশ্যে প্ল্যানিং কমিশনের বিলুপ্তি ঘটিয়ে কয়েকজন স্তাবক আমলার মাধ্যমে নীতি আয়োগ নামে একটি শূন্য ক্ষমতার সংস্থা তৈরী করেছিলেন তা, এখন পূর্ণতা পাচ্ছে।

Vol. 68 Issue No. 29 শনিবার ১৩ মার্চ ২০২১ আট
RN No. 2710/57 Rupees Two [By Air Rs. 2.10]
Phone : 2229-4653; e-mail : kranti.press@yahoo.com

বাসন্তী বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিলেন কম. সুভাষ নস্কর

১২ মার্চ মনোনয়ন পেশ করলেন কম. সুভাষ নস্কর। জননেতা কম. সুভাষ নস্কর মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন একপ্রকার বাসন্তী এলাকার মানুষের ভালোবাসায় ভর করে। বয়সের কারণে প্রথমে ভোটে দাঁড়াতে না চাইলেও, লকডাউন ও আমফানের পর বাসন্তী এলাকায় কান পাতলেই শোনা যাচ্ছিল কম. সুভাষ নস্করের নাম। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় বামকর্মী এবং বাসন্তীর মানুষের উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। এলাকার দুর্নীতি, সন্ত্রাসবিরোধী গণআন্দোলন ও সুভাষবাবুর ব্যক্তিগত ভাবমূর্তির উপর ভর করে অনেকটা নির্বাচনে লড়বেন এই বামপ্রার্থী। সাতবারের বিধায়ক ও মন্ত্রীর এবারের লড়াই মূলত তৃণমূল প্রার্থী শ্যামল মণ্ডল ও বিজেপি'র সাথে।

ক্যানিং থেকে ঝড়খালি রেলপথ সম্প্রসারণ, বেহাল রাস্তাঘাট, নদী-বাঁধ, সন্ত্রাস দমন, বেকারের কর্মসংস্থান, কৃষকের ফসলের ন্যায্য মূল্য এবারের নির্বাচনে বাসন্তীতে মূল দাবি। ক্যানিং আর এস পি দলীয় কার্যালয় থেকে সুসজ্জিত মিছিল সহকারে মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে মনোনয়ন পেশ করতে যান সংযুক্ত মোর্চা সমর্থিত আর এস পি প্রার্থী কম. সুভাষ নস্কর। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক কম. চন্দ্রশেখর দেবনাথ, সি পি আই (এম) নেতা কম. রতন বসু, আর এস পি ব্লক সম্পাদক কম. আকবর জমাদার সহ সংযুক্ত মোর্চার নেতৃত্বরা। মনোনয়ন জমা দিয়ে কম. সুভাষ নস্কর বলেন, 'জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের মূল লক্ষ্য, শিক্ষিত বেকারের যন্ত্রণা প্রকট হয়ে উঠেছে এবারের নির্বাচনে শাসকদলকে মানুষ এর জবাব দেবে।'

বাসন্তীতে নির্বাচনী জনসভা

নির্বাচন কমিশন ভোটের বাদ্যি বাজিয়েছেন কয়েক দিন হল। ঢাকে ভোটের কাঠি পড়ার সাথে সাথে রাজ্য জুড়ে প্রচারাভিযান, সভাসমিতি, মিটিং, মিছিলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। এর মধ্যে বাদ নেই বাসন্তী বিধানসভা কেন্দ্র। ১০ মার্চ বাসন্তীতে বামফ্রন্টের ডাকে অনুষ্ঠিত হল নির্বাচনী সভা। এদিনের সভা রীতিমতো জনসভায় পরিণত হয়। সাধারণ মানুষের উপস্থিতি উদ্দীপনা ও বাড়তি উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। সভাটি অনুষ্ঠিত হয় বাসন্তীর আর এস পি'র দলীয় কার্যালয়ের পার্শ্বস্থ মাঠে। এদিনের সভায় জমায়েত মাঠের গণ্ডি পেরিয়ে রাস্তারও দখল নেয় এলাকার স্বতস্ফূর্ত জনতা। এদিনের সভার জনসমাগমের ভাষা প্রমাণ করে যে বাসন্তীর মানুষ এতদিন সুশাসন থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আর এই বঞ্চনার জবার দিতে তৈরি বাসন্তীর সাধারণ জনতা। এদিন ঝড়খালি, নবাবগঞ্জ, ভরতগড়, জ্যোতিষপুর, মসজিদবাটি, বাসন্তী, সোনাখালি, ফুলমালঞ্চ, চড়াবিদ্যা, মোকামবেড়িয়া, কাঁঠালবেড়িয়া থেকে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। বাসন্তীর কোণায় কোণায় কান পাতলে শোনা যায় শাসক দলের উপর সাধারণ মানুষের বিরক্তি। বিগত নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী গোবিন্দ নস্কর জয়লাভ করার পর, একবারের জন্যেও বাসন্তীর মাটিতে পা রাখেন নি। এই সুযোগে বাসন্তীতে শাসকদলের নিচুতলার নেতা কর্মীরা অত্যাচার, দুর্নীতি, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়ে। বর্তমানে তোলাবাজি, সিন্ডিকেট ও আমফান ঘূর্ণিঝড়ে দুর্নীতি বাসন্তীর মানুষকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। বাসন্তীতে কান পাতলে শোনা যায় এর থেকে সুভাষ নস্কর অনেক ভালো ছিলেন, কাছের মানুষ ছিলেন। যখন এলাকার মানুষ লকডাউনে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে পশ্চিমবাংলার বাইরে ছিলেন সেই সময় বাসন্তীর মানুষের একমাত্র ত্রাতা হয়ে উঠেছিলেন সুভাষ নস্কর। আমফানে মানুষ যখন ঝড়ের তাণ্ডবে মাথার ছাদ হারিয়েছেন, বাসস্থানে নোনা জল, সেই সময় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন কম. সুভাষ নস্কর, কিন্তু দেখা মেলেনি বিধায়ক গোবিন্দবাবুর। এদিনের সভায় তার প্রতিফল লক্ষ করা যায় বলে মনে করেন উপস্থিত নেতৃত্বের একাংশ। শুধু সভায় নয় ভোটবাক্সেও এর প্রভাব পড়বে বলেও মনে করেন উপস্থিত নেতৃত্ববৃন্দ। বাসন্তীর মানুষ কিছুদিন আগেই আওয়াজ তুলেছিলেন যে কোনো বহিরাগত প্রার্থীকে তাঁরা মানবেন না। কিন্তু তৃণমূল গোষ্ঠিদ্বন্দ্ব ঠেকাতে ক্যানিং-এর বিধায়ক শ্যামল মণ্ডলকে প্রার্থী করায় তাঁরা আরও ফুঁসছেন। কারণ, তাঁদের বিগত দিনের অভিজ্ঞতা থেকে অর্থাৎ আগের বিধায়কের থেকে তাঁরা ঠকেছেন। তাই কাছের মানুষ হিসাবে এলাকার জনপ্রিয় জননেতা কম. সুভাষ নস্করের নাম মানুষের মুখে মুখে ঘুরছে। বিশেষ করে যুব সমাজের মধ্যে একটি বাড়তি উন্মাদনা লক্ষ করা যাচ্ছে। ছাত্র সংগঠন পি এস ইউ 'বাসন্তীতে সুভাষ চাই' বলে নানান ছড়া ও গান বেঁধে ফেলেছে। সেই গান ইতিমধ্যেই নেটপাড়ায় ঝড় তুলেছে। নির্বাচনের আগেই বহিরাগত প্রার্থীদের ছুঁড়ে ফেলার মানসিকতা প্রস্তুত করেছেন এলাকাবাসী। এদিনের সভা থেকে নেতৃবৃন্দ বেকারের কর্মসংস্থান, কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম, এলাকার উন্নয়ন ও শান্তি ফেরানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। গোসাবা-বাসন্তীর মানুষ দীর্ঘদিন ধরে ক্যানিং থেকে ঝড়খালি রেল সম্প্রসারণের যে দাবি করছিলেন, সেই থমকে যাওয়ায় রেলপথের কাজ শুরুর দাবি ওঠে এই সভা থেকে। উপস্থিত ছিলেন এবারের নির্বাচনের বাসন্তীর প্রার্থী কম. সুভাষ নস্কর, গোসাবার প্রার্থী কম. অনিল চন্দ্র মণ্ডল, আর এস পি জেলা সম্পাদক কম. চন্দ্রশেখর দেবনাথ, কম. লোকমান মোল্লা, সি পি আই (এম) নেতা কম. তুষার ঘোষ, কম. দীপঙ্কর শীল, আই এস এফ নেতৃত্ব সহ সংযুক্ত মোর্চার অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ। এদিনের সভা থেকে কম. সুভাষ নস্কর বলেন, 'বাংলায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীদের ভোট দিন। বাসন্তী এলাকার দীর্ঘদিনের সম্প্রীতির ঐতিহ্যকে বজায় রাখুন। কম. তুষার ঘোষ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নানান দুর্নীতি ও অপকর্মের কথা তুলে ধরেন। অনেক দিন ধরেই বাসন্তীতে আদি তৃণমূল ও নব তৃণমূলের মধ্যে বোমা বন্দুকের লড়াই হলেও থমকে রয়েছে এলাকার উন্নয়ন। বাসন্তী হাইওয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যস্ত রাস্তাটি খানাখন্দে ভরে আছে অথচ সরকারের কোনো হেলদোল নেই। কেন্দ্রীয় সরকার সাম্প্রদায়িক বিভাজন, গ্যাস সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি, তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির দুর্বৃত্তায়ন ও দুর্নীতি এবারের নির্বাচন সাধারণ মানুষের কাছে যথেষ্ট বিবেচ্য বিষয়। সুন্দরবনের এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের দীর্ঘকাল যাবৎ সংগ্রামের অভিজ্ঞতা। এবারের নির্বাচনে সেই অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে মানুষ লড়াই করতে প্রস্তুত। তৃণমূলী আক্রমণে বাম দলগুলির যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করেই কম. সুভাষ নস্কর এবারের নির্বাচনে বিপুল ভেটে জয়ী হবেন বলে অঞ্চলের মানুষ প্রত্যয়শীল।

রাজ্য ও কেন্দ্র শ্রমিকদের সুরক্ষার অর্থ লুঠ করছে

অশোক ঘোষ

গত এক বছরে লকডাউন চলাকালীন সময়ে গোটা দেশ স্তব্ধ থাকলেও, কেন্দ্রীয় সরকার তাদের শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কাজ চালিয়ে গিয়েছে। নির্বিবাদে শ্রমিকদের বিভিন্ন কল্যাণ তহবিলের টাকা সরিয়ে নিয়েছে। যেভাবে মমতা ব্যানার্জী শ্রমিকদের টাকা নিজের বিজ্ঞাপন সহ অন্য তহবিলে সরিয়ে নিয়েছে, সেইভাবেই শ্রমিকদের টাকা অন্য প্রকল্পে সরালো কেন্দ্র। কার্যত কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের নীতিতে মৌলিক কোনও ফারাক নেই। মমতা ব্যানার্জী'র সরকার এই কাজ শুরু করেছে অনেক আগে থেকেই, কেন্দ্র শুরু করলো লকডাউনের মধ্যে। এ ব্যাপারে মমতা মোদীর পথপ্রদর্শক।

শ্রমিক সংগঠনগুলির নির্দিষ্ট অভিযোগ—কর্মচারী রাজ্য বীমা (ই এস আই সি) প্রকল্পের তহবিল থেকে ৯০০ কোটি টাকা প্রধানমন্ত্রীর বহু বিজ্ঞাপিত, সাধের আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে সরিয়ে নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

দেশের শ্রমজীবী মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় চালু হয়েছিল ই এস আই। বলা হয় বিশ্বের অন্যতম ও বৃহত্তম স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সামাজিক সুরক্ষা ই এস আই। এই প্রকল্পে শ্রমিকদের চিকিৎসার ব্যয়ভার, চিকিৎসা জনিত কারণে মজুরি ছাঁটাই হলে তার ক্ষতিপূরণ জোগায় ই এস আই। শ্রমিকদের মজুরির ১ শতাংশ নিজস্ব দান ও শ্রমিকদের মজুরির ৩.২ শতাংশ হারে নিয়োগকর্তাদের অনুদানে গড়ে উঠেছে ই এস আই -এর বিপুল অর্থের তহবিল। শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার আড়ালে সেই তহবিল থেকেই চলতি অর্থবর্ষে ৯০০ কোটি টাকা সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের জন্য ন্যাশানাল হেলথ অথরিটির তহবিলে।

২০১৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ই এস আই সি এবং ন্যাশনাল হেলথ অথরিটির সঙ্গে চুক্তি সম্পাদিত হয় শ্রমিকদের চিকিৎসা হবে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে। চুক্তিতে বলা হয় আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে কোনও বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা হলে তিরিশ দিনের মধ্যে বিলের টাকা 'এন এইচ এ'কে মিটিয়ে দেবে ই এস আই সি এবং সার্ভিস ট্যাক্স বাবদ ন্যূনতম ১২.৫০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৭৫০ টাকা পর্যন্ত মিটিয়ে দেবে ই এস আই সি। কিন্তু ই এস আই সি তহবিল থেকে টাকা দেওয়া 'এন এইচ এ'কে, এমন শর্ত চুক্তিতে ছিল না।

গত ২২ ফেব্রুয়ারি ই এস আই সি'র ১৮৪তম সভায় বেনজিরভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় 'ই এস আই সি' তহবিল থেকে চলতি অর্থবর্ষের জন্য ৭০০ কোটি টাকা এবং ২০২০-২১ অর্থবর্ষের সংশোধিত হিসাব বাবদ ২০০ কোটি টাকা দেওয়া হবে এন এইচ এ'কে। শ্রমিকদের চিকিৎসার বিল বাবদ এবং সার্ভিস ট্যাক্স বাবদ অর্থ ছাড়া কেন রাতারাতি ৯০০ কোটি টাকা থোক হিসাবে লুট করা হলো? ই এস আই'র সভায় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন সমূহ যৌথভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছে এই ঘটনার।

আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে টাকার সংস্থান কেন্দ্রীয় সরকারের করার কথা। তার জন্য বাজেটে সংস্থান রাখারও কথা। ই এস আই গড়ে উঠেছে নির্দিষ্ট আইন অনুসারে। ই এস আই তহবিলের টাকা কোনও অবস্থাতেই অন্য কোনও প্রকল্পে সরানো যাবে না।

এই ধরনের প্রবণতা দেখা গিয়েছে তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জীর সরকারের মধ্যেও। তিনিও শ্রমিকদের টাকা সরিয়ে নিয়েছেন অন্য খাতে। নির্মাণ কর্মীদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে গঠিত হয় নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ তহবিল। মূলত ১০ লক্ষ টাকার বেশি ব্যয়ে নির্মিত হওয়া যে কোনও নির্মাণ কাজ থেকে ১% সেসের টাকা ওই তহবিলে যায়। সেই টাকা সরকারের অন্য কোনও প্রকল্পে খরচ হওয়ার কথা নয়। স্বশাসিত বোর্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল বিল্ডিং এ্যান্ড আদার কন্সট্রাকশন ওয়ার্কার্স মন্ত্রী জানিয়েছেন তিন ক্ষেপে মোট ১৬২০ কোটি টাকা সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের প্রয়োজনে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের নির্মাণ কর্মী কল্যাণ তহবিলে থাকার কথা ছিল ২৯০০ কোটি টাকা। স্বেচ্ছাসারীর মতো সরকার ক্রমাগত আইন ভাঙ্গছে। 'নির্মাণ কর্মী কল্যাণ তহবিল' নির্দিষ্ট আইন অনুসারে গড়ে উঠেছে। এই তহবিলের টাকা অন্য কোনও তহবিলে সরানো সম্পূর্ণ বেআইনি। এই টাকা সরানোর কারণেই লকডাউন পর্বে বহু নির্মাণ কর্মী এক-দু'হাজার টাকার নগদ আর্থিক সাহায্য পর্যন্ত পান নি।

রাজ্যে শ্রমিকদের জন্য যত ধরনের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প আছে, তার অধিকাংশই এখন আর যথাযথ কার্যকর নেই। নির্মাণ কর্মী, পরিবহন শ্রমিক, বিড়ি শ্রমিক, হকার এমন ৬১টি ক্ষেত্রের শ্রমিকদের এই সব সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার কথা। লকডাউন যেদিন শুরু হলো, সেই ২৪ মার্চ ২০২০ থেকে ৮ মে'র মধ্যে এরাজ্যে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন ৩ লক্ষ ৪৩ হাজার ১১৬ জন। জুন ২০২০ মাসে নথিভুক্ত হয়েছেন আরও ১ লক্ষ ৮৬ হাজার নতুন নাম। কিন্তু লকডাউন চলাকালীন সময়ে (অর্থাৎ জুলাই ২০২০ পর থেকে) সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে নাম লেখানো বন্ধ হয়ে যায়। কেবল তাই নয়, যাদের নাম লেখানো আছে তাদের সন্তানের শিক্ষা, পরিবারের চিকিৎসা বা কাজ হারানোর জন্য প্রাপ্য টাকার আবেদন পর্যন্ত করতে পারেন নি। পরিবহন, বিড়ি ও নির্মাণ কর্মীদের নির্দিষ্ট কল্যাণ তহবিল থাকা সত্ত্বেও এই দুঃসময়ে তা থেকে তারা সহায়তা পাননি। সরকার সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি সমূহ কার্যকর করছে না।

Printed and published by Manoj Bhattacharya from Kranti Press, 37 Ripon Street, Kolkata-700 016, Editor : Manoj Bhattacharya of behalf of RSP (Website : www.ganavarta.com)
Price Rs. 2/-